৩৫ ৬৭/১-৪

সাহিত্য পত্রিকা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বর্ষ ৬ □ সংখ্যা ১ □ অক্টোঃ-ডিসেঃ '৮৬ [শারদীয়]

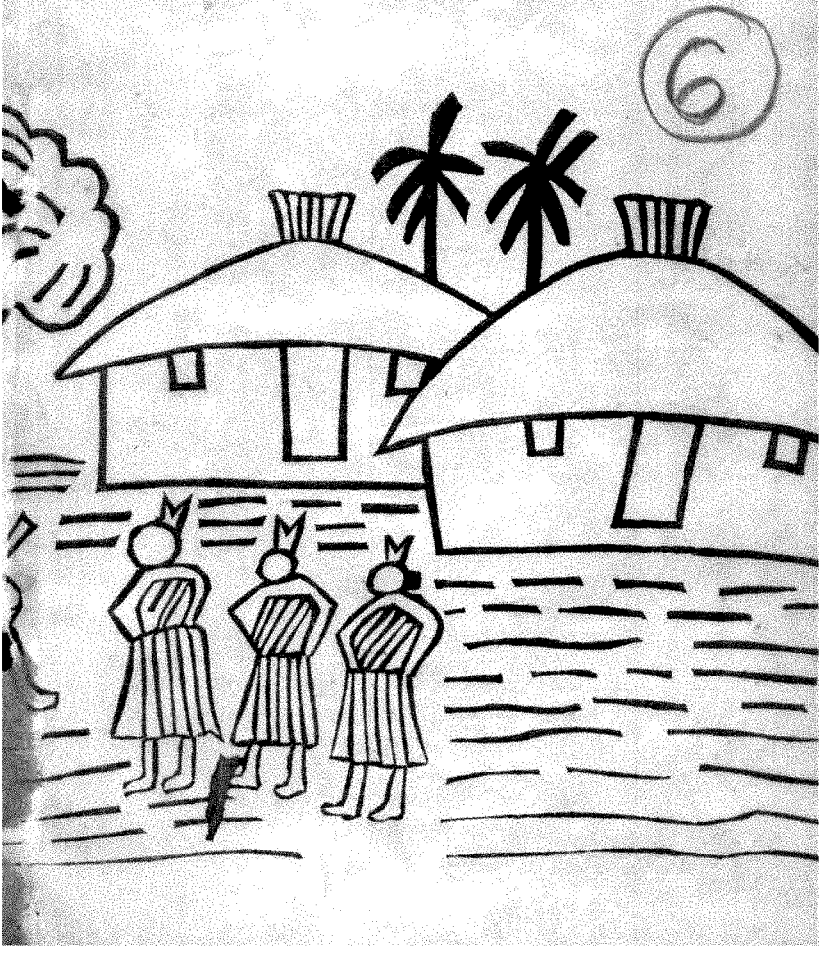

IT'S
THE
NAME
THAT
COUNTS

□

368771

The Company that encompasses
the entire range of Steel Products
from mild Steel to Super High Tensile
from Low Alloy to Creep Resisting Grad.

□

mahindra & mahindra
limited

CALCUTTA - BOMBAY - DELHI
MADRAS

আমরা কাজে নেমেছি অন্ধকার ঘুচিয়ে
মানুষের জীবনে আলো পৌঁছে দিতে

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেকদিন ধরে বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য
নেক অসুবিধে ভোগ করেছেন। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই
আজ সেই সংকটকে আমরা প্রায় অতিক্রম করতে পেরেছি,
র্ঘ পথের শেষে যেন আজ আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের সামনে এখন নতুন কাজ, নতুন দায়িত্ব, কেবল
ারও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করাই নয় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও
টন ব্যবস্থার মান আরও উন্নত করতে হবে, যাতে নিয়মিত,
ষ্ঠুভাবে, অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়। বিদ্যুৎ
রি ও অন্যান্য দুর্নীতি রোধ করতেই হবে।

প্রগতি ও পরিবর্তনের শুভকর্ম পথে পশ্চিমবঙ্গের
অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করতে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সংকল্পবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

াহিত্য সৈকত/শারদীয়/অক্টোঃ-ডিসেঃ.'৮৬

সমন্বয়িত গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচী, নদীয়া জেলা

গ্রামীণ দারিদ্রের প্রধান উপসর্গ স্বল্প ও অস্থায়ী আয় পরিবারে মাত্র ১ জন অস্থায়ী আয়, পরিবারে মাত্র ১ জন উপার্জনক্ষম কর্মী এবং গড়ে ৪ জন নির্ভরশীল মানুষ।

এই পটভূমিকায় নদীয়া জেলাতে আমরা পঞ্চায়েত ব্লক ব্যাংক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ও সক্রিয় সহযোগিতায় সমন্বয়িত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (আই-আর ডি. পি) প্রণয়ন ও রূপায়ণে ব্রতী হয়েছে।

যদিও আমাদের অগ্রগতি খুব সন্তোষজনক হয়নি তথাপি বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য আশাপ্রদ। উল্লেখযোগ্য এ যে এই কর্মসূচী রূপায়ণে জেলার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ব্যাংক ও ব্লকের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন।

ডি আর ডি. এ. কার্য্যালয়ে আধিকারিক ও কর্মীগন এই প্রকল্প সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ও যত্নশীল।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : প্রকল্প রূপায়ণ বিশ্লেষ

১।	উপকৃত পরিবারের সংখ্যা	৪১৭০৬
২।	মোট প্রকল্প ব্যয় :—	৯১০ লক্ষ টাকা
	(ক) অনুদান :—	৩৬০ লক্ষ টাকা
	খ ব্যাংক ঋণ :—	৫৫০ লক্ষ টাকা
৩।	পরিবার প্রতি গড় বিনিয়োগ :—	২৫৫০ টাকা
	(ক) গড় অনুদান :—	৮৬৪ টাকা
	(খ) গড় ব্যাংক ঋণ :—	১৬৮৬ টাকা

১৯৮৫-৮৬ সালের প্রকল্প রূপায়ণ বিশ্লেষণ

১।	উপকৃত পরিবার সংখ্যা :	১৭০১৩
২।	মোট প্রকল্প ব্যয় :	১৭৮ লক্ষ টাকা
৩।	পরিবার প্রতি গড় বিনিয়োগ	৩০১৮ টাকা
	(ক) অনুদান :—	১০৪৩ টাকা
	(খ) ব্যাংক ঋণ :—	১৯০৫ টাকা

১৯৮৬-৮৭ সালে নদীয়া জেলার লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ১০২০০ পরিবারকে আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র সীমা অতিক্রম করতে সহায়তা প্রদান করা। আমরা আশা করি রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও সকলের নিষ্ঠাযুক্ত প্রচেষ্টায় আমরা সফলতা অর্জন করবো।

কৃষ্ণনগর, ২৯ আগষ্ট, ১৯৮৬ *প্রকল্প আধিকারিক*

নদীয়া জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম লিঃ

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

ক্ষুদ্রশিল্পে রেজেষ্ট্রীকৃত উৎপাদনকারী সংস্থা সমূহ অতি শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের মাধ্যমে নিজ কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহন করতে পারেন। বিশেষতঃ কাঠ ও লৌহজাত আসবার পত্র, ইনভারটার, ফ্যান, প্লাষ্টিক ও এ্যালুমেনিয়াম ইউটেনসিলস্, টিউবওয়েল হাণ্ড্ পাম্প, ম্যানহোল কভার ফিসিংহুক্স, জি আই বাকেট, প্রভৃতির প্রস্তুতকারী ইউনিট সমূহকে অবিলম্বে উপরোক্ত ঠিকানায় মার্কেটিং শাখার সহিত যোগাযোগের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

—জনসংযোগ আধিকারিক ॥

'গ্রামীণ'

এনেছে অপরূপ রুচিসম্মত বস্ত্রসম্ভার

১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই অক্টোবর, ১৯৮৬ পর্যন্ত

: বিশেষ রিবেট :

সুতি খাদি—৩৫ শতাংশ
রীল্ড সিল্ক—২০ ,,
স্পান সিল্ক—৩০ ,,
পলিবস্ত্র—৪০ ,,

আদি ও অকৃত্রিম বালুচরী, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, আধুনিক পলিবস্ত্র এবং ঐতিহ্যপূর্ণ সুতি, রেশম ও পশম খাদির রঙ রুচি ও ডিজাইনের মনোরম পসরা।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ,

২, মুজাফ্ফর আহমেদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

[প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।]

শরতের আকাশে সোনা ঝরে। মাঠে সাদা কাশফুলে দুলুনি। খোলা মনে রঙের বাতাস। এরা এলেই বোঝা যায় পুজো এসে গেলো।

পুজো মানেই তো আনন্দ। ক'টা দিনের প্রিয় সান্নিধ্য। এই দিনে প্রিয়জনকে কিছু উপহার না দিলে চলে! এই সুখের দিনে প্রিয়ার হাতে অঙ্গুরীয়টি তুলে দেবার জন্যেই না সারা বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

ভাবনা নেই, প্রিয় বস্তুটি আমরা আপনার জন্যে তৈরী করেই রেখেছি।

সকলকে স্বাগত

এ, টি, জুয়েলার্স

ফুলিয়া রেলবাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া।

(মাছ বাজারের সন্নিকট)

প্রো ঃ—শৈলেন কুমার কর্মকার

বিঃ দ্রঃ—আমাদের দোকান বুধবার পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে।

সাহিত্য সৈকত

বর্ষ ৬ □ সংখ্যা ১ □ অক্টোঃ-ডিসে '৮৬ [শারদীয়]

সূচী

□ সম্পাদকীয় ৭

□ প্রবন্ধ

কেন্দ্রীকরণ, যুদ্ধ ও শান্তি : পান্নালাল দাশগুপ্ত ৯

চেতনার রূপান্তর ও শ্রীঅরবিন্দ : হরপ্রসাদ মিত্র ১৫

□ কবিতা/ছড়া : শিশির গুহ
অনন্ত মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবানী চক্রবর্তী ১৯-২০

□ গল্প

৫টি জেলার লোকভাষায় লেখা গল্পঃ

করুণা কান্ত রায়
কোচবিহার, মেদিনীপুর, কাকলি ভট্টাচার্য
মুক্তি মুখোপাধ্যায় ২১-৬০
বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, সাধন কুমার রক্ষিত
নদীয়া। মনোহর বসাক

□ 'সাহিত্য সৈকত' পত্রিকার পাঁচ বছরের রচনাপঞ্জী ৬১

□ প্রচ্ছদ : কাকলি ভট্টাচার্য

With Best Compliments Of :

Gram : BINDAWALA
Telex : RAM 021-2480

PHONE : 33-5950/0450

BINDAWALA CABLES & CONDUCTORS (P) LTD.

MANUFACTURERS OF AAC, ACSR CONDUCTORS

6, HANSPUKUR FIRST LANE.
CALCUTTA-700 007

Works : K. C. Sen Road,
Rishra, Hoogly.
Phone : 62-1593

সাহিত্য সৈকত

—এর পরবর্তী সংখ্যা মূলতঃ প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের।

নবীনরা লেখা পাঠান।

দশ টাকা পাঠিয়ে বাৎসরিক গ্রাহকভুক্ত হয়ে পত্রিকাকে সহযোগিতা করুন।

সম্পাদকীয়

গোস্বামী তুলসীদাস যখন রামচরিত মানস' কাব্যখানি লিখে বন্ধুদের পড়ে শোনালেন, সকলেই বলে উঠলো-না, না এ চলবে না।

তুলসীদাস আশাহত হলেন। কয়েকজন বিদগ্ধ পণ্ডিতকে পড়ে শোনালেন। চলা না চলা দূরে থাক শুনেই তাঁরা ক্ষেপে গেলেন।—এ তুমি করেছোটা কি?—মহাপাতকের কাজ করেছ। দেবতার মুখ দিয়ে কীনা মানুষের মুখের ভাষায় কথা বলিয়েছ! এ পাপ, মহাপাপ।

তুলসীদাস বুঝে উঠতে পারলেন না, যে ভাষায় মানুষ কথা বলে সেই ভাষা দিয়ে কাব্য-সাহিত্য রচিত হলে ক্ষতিটা কোথায়!—মনে মনে কষ্ট পেলেন তুলসীদাস।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন। পাণ্ডুলিপিখানি হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন তিনি একদিন।

বৃত্তান্ত শুনে মধুসূদন বললেন-পাণ্ডুলিপিখানি রেখে যান, পড়ে দেখবো। ক'দিন বাদে এসে খবর নেবেন।

ক'দিন বাদে তুলসীদাস গেলেন। শংকিত মন। মনে মনে ভাবলেন মধুসূদন সরস্বতী যদি কিছুই হয়নি বলেদেন তো, এ সৃষ্টি আর তিনি রাখবেন না, গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে দেবেন।

তুলসীদাস মধুসূদন সরস্বতীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তুলসীদাসকে দেখা মাত্র মধুসূদন দু'বাহু বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—একটা মহৎ কাজ করেছেন আপনি। মানুষের মুখের ভাষা দিয়ে মহাকাব্য লিখেছেন আপনি। মানুষের ঘরে ঘরে একদিন তা' পরম আদরে লালিত হবে দেখবেন।

হয়েছেও তাই। বস্তুত মধুসূদনই সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন তুলসীদাস ও তাঁর 'রামচরিত মানস' কাব্যখানিকে।

আজ তুলসীদাস নেই। তুলসীদাসের সময়কার মুখের ভাষাও আর সে জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, কিন্তু বেঁচে আছে এখনও 'রামচরিত মানস' কাব্যখানি।

পরিবর্তনশীল মানুষের জীবনে যে কোন ভাষা মাত্রেই পরিবর্তন ধর্মী। ম্যাকস্‌মুলার বলেছেন—'The real and natural life of language is in its dialects,"—অর্থাৎ ভাষার প্রাণটা হল ভার উপভাষাগুলোর মধ্যে। কিন্তু সাহিত্যিকের ভাষা এই উপভাষাগুলো থেকে একটু দূরে দূরে থেকে স্বতন্ত্র এক একটা পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চায়। সাহিত্যের সংসার এই উপভাষাগুলোকে কখনই বড় পাত পেতে দেয়নি। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কথ্য ভাষাও স্বাভাবিক নিয়মেই রূপ বদলায় কোন কোন শব্দতো একেবারেই হারিয়ে যায়। মানুষের এই সংস্কৃতিকে এই মুখের কথাকে ধরে রাখার বড় কোন উদ্যোগ উৎসাহ আমাদের দেশে নেই এখনও। ঢাকার বাংলা একাডেমী কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের কাজ করেছেন। আমাদের কলকাতায় নব প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি কিছু করবেন কীনা জানিনা।

সাহিত্য সৈকত' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় অন্যান্য অনেক রচনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ৫টি জেলার লোক ভাষায় রচিত গল্প ছাপা হয়েছে। মুখের ভাষা দিয়ে এরকম গল্প লেখা ইতিপূর্বে হয়েছে কীনা জানিনা। ইচ্ছে আছে বাকী জেলাগুলোর মুখের ভাষাও তুলে ধরবো গল্পের আকারে পরবর্তী কোন সংখ্যায়।

তুলসীদাসের যুগ এখন আর নেই। আজকের মানুষের কাছে আজকের জীবন্ত কথ্য ভাষার সাহিত্য যদি সমাদৃত হয় তো আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

কেন্দ্রীকরণ, যুদ্ধ ও শান্তি

পান্নালাল দাশগুপ্ত

কেন্দ্র বনাম রাজ্য নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই নানা বিতর্ক বিক্ষোভ ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। যদিও ভারতের শাসনতন্ত্র ফেডারেল বলে কথিত, তথাপি ফেডারেল' কিংবা 'ইউনিটারি' শব্দ দুটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের অর্থ ঠিক রাখতে পারেনি। ইংরেজ যখন এই দেশে রাজত্ব করতো, তখন তারা দিল্লীর এককেন্দ্রিক শাসন প্রথাই চালু করেছিল। ভারত স্বাধীন হবার পরে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য ও কেন্দ্রের হাতে কি কি ক্ষমতা থাকবে, রাজ্যের হাতেই বা কোন কোন ক্ষমতা থাকবে, এসব বিচার বিবেচনা করতে গিয়ে কখনও ফেডারেল, কোথাও ইউনিটারি প্রথার কেন্দ্রিকতা, কোথাও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশ গঠনের প্রচেষ্টায় পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং এর প্রয়োজনে সংবিধানের এমন একটা জগাখিচুরি চেহারা দাঁড়িয়ে গেলো যে এই শাসন প্রথার প্রায় চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ নানা প্রশ্ন উপস্থিত! তার মধ্যে একটি হলো কেন্দ্রের ক্ষমতা খর্ব করা না আরও বাড়ানো। রাজ্যগুলির ক্ষমতা কী করে বাড়ানো যায়। তদুপরি এখন আবার দেখা দিয়েছে ethnic বা জাতি উপজাতি ভিত্তিক আরও কয়েকটি রাজ্য স্থাপনের আন্দোলন। যথা ঝাড়খণ্ড গোর্খাল্যাণ্ড, উত্তরখণ্ড, কামতাপুরি, মিজোরাম, অরুণাচল ইত্যাদি। তাছাড়া খালিস্তানি শিখদের দাবিতো বোধহয় আলাদা একটা রাষ্ট্রই করে ফেলা। স্মরণ রাখা দরকার যে একদা ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্থান নামক দুটি দেশে ভাগ করে ফেলার জন্যই, ভারতের যাতে আরও খণ্ডন না ঘটে তার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অনেক ক্ষমতা রাখা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ভারতের ঐক্য ও সংহতি বেশী ভালো ভাবে রক্ষা করা যাবে, না রাজ্য ও প্রান্তগুলিকে আরও ক্ষমতা দিলে, উপজাতিদের জন্যও আলাদা আলাদা রাজ্য দিয়ে দিলে ভারতের ঐক্য ও সংহতি বেশী সুনিশ্চিত হবে, এটাই হলো প্রশ্ন। আজ এই প্রশ্নটা থিয়োরেটিক্যাল নয়, বাস্তব।

যদি বাস্তবের মাপকাঠিটাই বড় করে ধরি তবে, দেখা যাক, ভারতের অবস্থাটা এখন কী। ভারতের মাথার উপর খড়্গের মত উদ্যত হয়ে আছে তার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। পাকিস্থান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই নাজুক। পাকিস্থানের যত সামরিক প্রস্তুতি তা নিশ্চয়ই রাশিয়াকে লক্ষ্য করে নয়। ভারতই তার টার্গেট হতে পারে। তাছাড়া গত তিন তিনটা যুদ্ধে পাকিস্থান হেরে যাবার জন্য, তথাকার রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে কারও কারও ভারতের বিরুদ্ধে একটা চরম-প্রতিশোধের বাসনা থাকা অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মেনীর শোচনীয় পরাজয় এর ক্ষতকে উস্কে উস্কেই একদা হিটলারের মত একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব হয়েছিল। তার অর্থ এই নয়, পাকিস্থানেও ওজাতীয় কোন একটা জেহাদী প্রতিশোধের জেদ গড়ে উঠবেই। তবে তা যাতে না হয়, তার জন্য সতর্ক হতে হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা প্রতিষেধক ব্যবস্থা দ্বারা অতীতের সেই ক্ষত স্থানটা মুছে দিতে হবে। সেটা একা ভারত বা একা পাকিস্থানের উপরেই নির্ভর করে না। আন্তর্জাতিক বড় বড় শক্তিগুলির উপরেও তা নির্ভর করে। কেন আমাদের (ভারত উপমহাদেশের) সমস্যা মেটাবার জন্য বহির্বিশ্বের বড় বড় শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে, সে প্রশ্নও করা চলে, এবং করা উচিত। করা উচিত নয় শুধু সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই উপমহাদেশের শান্তি ও আর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রোগ্রাম তৈরী করা দরকার।

কিন্তু ব্যাপারটা সেদিকে যাচ্ছেনা, বরং ঐ পথের ঠিক বিপরীতই ঘটছে। পাকিস্থানও পারমানবিক বোমা বানাবে বা বানাচ্ছে, ভারতও তা করতে পারবে। পাকিস্থান আমেরিকা থেকে অতি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও বিমানবহর সংগ্রহ করছে। কাজেই ভারতকেও এসব সংগ্রহ করতে হবে। আবার ভারতের শিল্পশক্তি নাকি আজ এতটা অগ্রসর যে অতি উন্নত ধরণের বিমান ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র ভারত নিজেরাই করতে পারবে, এবং বিদেশ থেকে পাওয়া বিমান (যেমন MIG 29) তারাত নিজেরাই করতে উদ্যত।

যুদ্ধ হোক আর না হোক, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিটাও এই ভাবে একটা প্রতিযোগিতার চক্রে পড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের জন্য উভয় দেশের প্রস্তুতি করতে গিয়ে অথবা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি করতে গিয়ে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন সীমাই আজ এই দুই দেশকে মানা সম্ভব হচ্ছে না। যুদ্ধ না লাগলেও, প্রতিরক্ষার খাতে ব্যয় বরাদ্দ এক পয়সা কমানো যাচ্ছে না। উপরন্তু একটা যুক্তি হলো এই যে, যুদ্ধ সত্যি সত্যি ঠেকিয়ে রাখতে হলে, যুদ্ধ প্রস্তুতি এমন হওয়া চাই যে মারাত্মক প্রতিশোধ বা massive retaliation এর ক্ষমতা তৈরী করে রাখতে হবে। এই প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা যত তাৎক্ষণিক হবে, যুদ্ধ ততই পিছিয়ে যাবে ইত্যাদি। অতএব যুদ্ধ বন্ধ রাখার উপরে হলো আরও আরও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া। ফলে এ দুষ্টচক্রের কোন শেষ দেখা যাচ্ছেনা।

ভারত কেবল বিদেশ থেকে আধুনিক যুদ্ধ বিমানই কিনবে বা কিনছে না উপরন্তু এসব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরীও করছে। কিন্তু এই সব High-tech যন্ত্রপাতি তৈরী করতে যে ধরণের Industrial base থাকা দরকার, সেটাত করতে হবে। অর্থাৎ দেশের শিল্পায়ণকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই

অগ্রসর হতে হবে। সংক্ষেপে যাকে বলা হয়, militarization of Industres অতএব সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকেই সামরিক লক্ষ্য সাধনের দিকে নজর রেখে গড়ে তুলতে হবে। কেবল শিল্পায়ণেরই সামরিক প্রয়োজনের অগ্রাধিকার দিতে হবে তা নয় যোগাযোগ বা communication (রোড, রেল, জাহাজ, উড়োজাহাজ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি) সমস্ত ব্যবস্থাকেই সমরসজ্জা বা প্রতিরক্ষার স্বার্থে পুনর্গঠিত করে নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত কৃষিতেও এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

এবং এর জন্য প্ল্যানিং তাও কেন্দ্রীকতা পেতে বাধ্য। বড় বড় শিল্পায়ণের পথে, অতি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের পথে ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প কখনও প্রাধান্য পাবে না। দেশের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বিকেন্দ্রিক পথ, গ্রামস্বরাজ ও স্বাদেশিকতার পথ, সরল সহজ জীবনের পথ, গ্রাম স্বরাজের পথ উপরোক্ত প্রতিরক্ষাকেন্দ্রিক শিল্পায়ণ ও পরিকল্পনার কাছে কোন পাত্তাই পাবে না।

দেশই যদি বিপন্ন হয়, দেশের স্বাধীনতাই যদি চলে যায়, তবে থাকবে কি? এই সহজ প্রশ্নটি একটা বিরাট আতঙ্ক সৃষ্টি করবেই। খাই না খাই, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই হবে। সে স্বাধীনতা যেন দিনকে দিন বিপন্ন হয়েই উঠছে।

এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে "শক্তিমান কেন্দ্র" চাই। সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু ও জোরদার করতে যে শিল্পশক্তি দরকার তাও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন থেকেই আসতে পারে। তাছাড়া আজ রাজ্যে রাজ্যে নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তার মোকাবিলার জন্যও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক, পুরা সামরিক বাহিনীর ডাক পড়ছে ও আরও পড়বে।

ফলে কেন্দ্রের ক্ষমতা কম করে দেবার বাস্তব পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হচ্ছে না। ভাবাই যাচ্ছেনা, কেন্দ্রের শক্তি কমিয়ে

কিন্তু ব্যাপারটা সেদিকে যাচ্ছেনা, বরং ঐ পথের ঠিক বিপরীতই ঘটছে। পাকিস্থানও পারমানবিক বোমা বানাবে বা বানাচ্ছে, ভারতও তা করতে পারবে। পাকিস্থান আমেরিকা থেকে অতি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও বিমানবহর সংগ্রহ করছে। কাজেই ভারতকেও এসব সংগ্রহ করতে হবে। আবার ভারতের শিল্পশক্তি নাকি আজ এতটা অগ্রসর যে অতি উন্নত ধরণের বিমান ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র ভারত নিজেরাই করতে পারবে, এবং বিদেশ থেকে পাওয়া বিমান (যেমন MIG 29) তারাত নিজেরাই করতে উদ্যত।

যুদ্ধ হোক আর না হোক, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিটাও এই ভাবে একটা প্রতিযোগিতার চক্রে পড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের জন্য উভয় দেশের প্রস্তুতি করতে গিয়ে অথবা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি করতে গিয়ে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন সীমাই আজ এই দুই দেশকে মানা সম্ভব হচ্ছে না। যুদ্ধ না লাগলেও, প্রতিরক্ষার খাতে ব্যয় বরাদ্দ এক পয়সা কমানো যাচ্ছে না। উপরন্তু একটা যুক্তি হলো এই যে, যুদ্ধ সত্যি সত্যি ঠেকিয়ে রাখতে হলে, যুদ্ধ প্রস্তুতি এমন হওয়া চাই যে মারাত্মক প্রতিশোধ বা massive retaliation এর ক্ষমতা তৈরী করে রাখতে হবে। এই প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা যত তাৎক্ষণিক হবে, যুদ্ধ ততই পিছিয়ে যাবে ইত্যাদি। অতএব যুদ্ধ বন্ধ রাখার উপরে হলো আরও আরও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া। ফলে এ দুষ্টচক্রের কোন শেষ দেখা যাচ্ছেনা।

ভারত কেবল বিদেশ থেকে আধুনিক যুদ্ধ বিমানই কিনবে বা কিনছে না উপরন্তু এসব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরীও করছে। কিন্তু এই সব High-tech যন্ত্রপাতি তৈরী করতে যে ধরণের Industrial base থাকা দরকার, সেটাত করতে হবে। অর্থাৎ দেশের শিল্পায়নকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই

অগ্রসর হতে হবে। সংক্ষেপে যাকে বলা হয়, militarization of Industres অতএব সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকেই সামরিক লক্ষ্য সাধনের দিকে নজর রেখে গড়ে তুলতে হবে। কেবল শিল্পায়নেরই সামরিক প্রয়োজনের অগ্রাধিকার দিতে হবে তা নয় যোগাযোগ বা communication (রোড, রেল, জাহাজ, উড়োজাহাজ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি) সমস্ত ব্যবস্থাকেই সমরসজ্জা বা প্রতিরক্ষার স্বার্থে পুনর্গঠিত করে নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত কৃষিতেও এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

এবং এর জন্য প্ল্যানিং তাও কেন্দ্রীকতা পেতে বাধ্য। বড় বড় শিল্পায়ণের পথে, অতি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের পথে ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প কখনও প্রাধান্য পাবে না। দেশের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বিকেন্দ্রিক পথ, গ্রামস্বরাজ ও স্বাদেশিকতার পথ, সরল সহজ জীবনের পথ, গ্রাম স্বরাজের পথ উপরোক্ত প্রতিরক্ষাকেন্দ্রিক শিল্পায়ণ ও পরিকল্পনার কাছে কোন পাত্তাই পাবে না।

দেশই যদি বিপন্ন হয়, দেশের স্বাধীনতাই যদি চলে যায়, তবে থাকবে কি? এই সহজ প্রশ্নটি একটা বিরাট আতঙ্ক সৃষ্টি করবেই। খাই না খাই, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই হবে। সে স্বাধীনতা যেন দিনকে দিন বিপন্ন হয়েই উঠছে।

এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে "শক্তিমান কেন্দ্র" চাই। সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু ও জোরদার করতে যে শিল্পশক্তি দরকার তাও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন থেকেই আসতে পারে। তাছাড়া আজ রাজ্যে রাজ্যে নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তার মোকাবিলার জন্যও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক, পুরা সামরিক বাহিনীর ডাক পড়ছে ও আরও পড়বে।

ফলে কেন্দ্রের ক্ষমতা কম করে দেবার বাস্তব পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হচ্ছে না। ভাবাই যাচ্ছেনা, কেন্দ্রের শক্তি কমিয়ে

দিয়ে দেশ রক্ষা, এমন কি দেশের ভিতরকার আইন শৃঙ্খলাই বা কী করে রক্ষা করা যাবে।

আধুনিক যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রয়োজনে একটি সামান্য উদাহরণে উপস্থিত করছি। সম্প্রতি ওড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার উপকূলবর্ত্তী বত্রিশটি গ্রামের গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করার একটা নোটিশ জারি করছেন ভারত সরকার। কেননা ওখানে আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে। এই আদেশটা কত বড় সাংঘাতিক বিপদ ঐ নিরীহ গ্রামগুলির! কিন্তু দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে কোথাও না কোথাও এজাতীয় পরীক্ষণ-কেন্দ্র চাই-ই, এবং সেটা নিশ্চয় কোন বিদেশে করা সম্ভব নয়। ভারতের কোন উপনিবেশও নেই যে তাতে করা যেতে পারে!

এ ক্ষেত্রে মস্ত একটা বিবেক-দংশনকারী প্রশ্ন উপস্থিত। যদি ঐ গ্রামগুলি উঠে যেতে না বলি, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভারতের এজাতীয় কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দরকারই নেই বলতে হয়! ভারত কি তবে একটি খোলা-দেশ হবে, তার কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে না? এজাতীয় জটিল বিবেক-দংশনকারী প্রশ্ন আমাদের আরও আরও আসতেই থাকবে, যদি পৃথিবীতে যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রতিযোগিতার লড়াইটা এভাবেই চলতে থাকে। কেবল ভারত পাকিস্থানের ব্যাপারেই নয়, সারা পৃথিবীতেই হয় যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে হবে, নয়তো সারা পৃথিবীতেই শান্তির জন্যও একটা বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। এবং যুদ্ধ যদি না হয়, তবে দেশে দেশে কেন্দ্রীকতার প্রয়োজনটা সহসা কমে যাবে, বেলুন যেমন ফেটে গেলে চুপসে এতটুকু হয়ে যায়।

ভারতের বা অন্যান্য গরীব দেশগুলির আর একটি বড় সমস্যা হলো - দারিদ্র। দারিদ্রদূরীকরণটা হবে যদি অর্থনৈতিক উদ্যম বড় করে সৃষ্টি করা যায়। এই অর্থনৈতিক উদ্যম high-tech industry বা বৃহৎ শিল্পায়ণের পথেও হতে পারে, আবার গ্রামে

গ্রামে মোটা ভাত কাপড় তৈরীর উত্তম সৃষ্টি করেও সম্ভব। আমরা কোন্ পথে যাবো বা যাচ্ছি? চাষ বাস ইত্যাদি সাধারণ কর্মকাণ্ডেও আমরা ক্রমশই আধুনিক শিল্পায়ণের সাহায্য নিচ্ছি—সেখানেও স্বদেশী সমাজের আদর্শকে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ণের পথ পরিহার করে চলেছি। এবং এটা যে করছি, তার একটি কারণ আধুনিক প্রতিরক্ষাভিত্তিক সামগ্রিক শিল্পায়ণের পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে গিয়েই।

অতএব এখানে একটা কঠিন ও মস্ত সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন উপস্থিত। কেন্দ্রীকরণ আমরা চাই না, চাই বিকেন্দ্রীকরণ, চাই স্বরাজ। যদি তা চাই তবে যুদ্ধের পথ ছাড়তে হবে। এমন একটা পথ ধরতে হবে যে পথে যুদ্ধ নেই, প্রতিযোগিতা নেই—আছে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। কেন্দ্রীকরণের নানা বিকৃতি ও যুদ্ধের মহতীবিনষ্টি—এ দু'টোকে একই সঙ্গে পরিত্যাগ বা পরিহার করতে হলে, আমরা সত্যি কী চাই, সেটা সম্বন্ধে পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে। সরল সহজ সহযোগিতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও আশঙ্কাআকা র সীমা নির্দ্দিষ্ট করার দরকার আছে। সবাই আমরা স্বরাজ চাই, শান্তি চাই, কিন্তু স্বরাজ ও শান্তি চাইতে গেলে প্রতিদিনের জীবনে যে-ধরণের ভাবনা চিন্তা কার্যকর করতে হবে, সে সব এড়িয়ে যেতে চাই। Aldous Huxely তাঁর বিখ্যাত পুস্তক—Ends & Means এ এই কথাটাই পঞ্চাশ বছর আগেই তুলেছিলেন। We all want peace, but we are not prepared to do such things in our daily life which will bring peace. পৃথিবীতে ও ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি আনতে হলে, এবং ভারতে বা পাকিস্থানে বা বাংলাদেশে কেন্দ্রীকরণ ও সামরিক স্বৈরাচারের পথ বন্ধ করতে হলে, প্রত্যেকটি মানুষের চলাফেরা, মূল্যবোধ ও জীবনযাত্রা পাল্টাতে হবে। এই সব অভিশাপগুলির মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে এদের মোকাবিলা যদি করতে হয়, তবে তাদের একসঙ্গেই মোকাবিলা করতে হবে।

চেতনার রূপান্তর ও শ্রীঅরবিন্দ

হরপ্রসাদ মিত্র

অজস্র সংশয় সত্ত্বেও মানুষকে বারবার ফিরতে হয় যা শ্রেষ্ঠ, যা সত্য, যা অবিমিশ্র আনন্দ এবং যার মধ্যে অমরত্বের চরিতার্থতা সম্ভব সেই দিকেই। সূচনা সূত্রেও যা পরিণামেও সেই একই। প্রজ্ঞা চায় ঈশ্বর জ্যোতি, স্বাধীনতা, অমরত্ব। অথচ প্রত্যেক জাতির আদর্শ যদিও এইসব প্রার্থনা, প্রতিদিনের জীবনে তবু এদের বিপরীত লক্ষণই দৃশ্যমান। সাধারণ অহংবুদ্ধি ও স্থূল অহংচেতনা থেকে, মরণশীল, পরিবর্তনশীল দেহপঞ্জির থেকে অতিমানসিক জ্যোতির্ময়তায় উত্তরণের ধারণা দেখা দিলেই বুঝতে হবে প্রকৃতির গহন অভিপ্রায়টি কী রকম। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, অস্তিত্বের সকল সমস্যাই হোলো মূলত সামঞ্জস্য রক্ষার সমস্যা।

বিবর্তনের ধারায় জড় থেকে প্রাণ ও মনের ক্রমবিকাশের কথা বলা হয় বটে কিন্তু তাতে শুধু প্রাণ, মন ইত্যাদি ঘটনার কথাই সূচিত হয়—ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এক্ষেত্রে বেদান্তের কথাই স্মরণ ধর্তব্য—জীবন বা প্রাণ জড়েই নিহিত ; মন আবার প্রাণেই নিহিত। জড় হোলো এক রকম আবরণে আবৃত প্রাণ, প্রাণ হোলো আবৃত চৈতন্য—'a form of veiled conciousness' স্থূল সীমিত মানব চৈতন্যের পক্ষে মনের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, এ-বিষয়ে তাঁর কোনো সংশয় ছিলনা। তাঁর কথায়—" The animal is a living laboratory in which Nature has, it is said, worked out man. Man himself may well be a thinking and living laboratory in whom and

with whose concious co-operation she wills to work out the superman, the god, or shall we not say, rather, to manifest god ?"

অর্থাৎ 'নেচার' বা প্রকৃতির পরীক্ষাগারেই জড় থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে মন,— মনের ও ক্রমোত্তরণ সম্ভব হয়েছে। এই ব্যাপারে মানব-চৈতন্যের স্বেচ্ছাপূর্ণ সহযোগিতাও প্রকৃতি-ই অভিপ্রেত।

তাঁর দিব্যজীবনের ভাবনা জড়, প্রাণ, মন, অতিমানস ইত্যাদি তত্ত্বধারা অবলম্বনে পরিস্ফুট। তাঁর দর্শন বেদে উপনিষদে আশ্রিত। ক্রমবিকাশে বিশ্বাসী তিনি। সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি. পুরুষোত্তমের ধারণা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে কথার-কথা মাত্র। কিন্তু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যুক্তি-তর্ক পরিহার করেছেন, একথা কিছুতেই বলা যায়না। যোগের পথে দিব্যতায় রূপান্তরিত হওয়া সাধক চেতনার পক্ষেই সম্ভব। এই যোগ অবশ্য 'পূর্ণযোগ'। পূর্ণযোগ পুরোপুরি নতুন পথ. একথাও তিনি বলেননি। সচ্চিদানন্দের কৃপা এবং সীমিত দেহ-মনের অধিকারী মানুষের তপস্যা দুই-ই চাই। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির উল্লেখ তাঁর রচনায় বারবার ঘটেছে এবং বেদ-উপনিষদ-গীতার প্রসঙ্গ তিনি ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করেন।

বৈদিক ধর্মের তত্ত্ব তাই অবশ্যই মনে আসে। বেদ আমাদের প্রাচীনতম ধর্ম শাস্ত্র। এই অপৌরুষেয় বৈদিক সাহিত্য মানে একটি মাত্র গ্রন্থ নয়। বেদের দুই ভাগ ১] মন্ত্র ও ২] ব্রাহ্মণ। মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ, 'ব্রাহ্মণ অংশ গদ্য বাহিত হলেও সে-অংশে মাঝে মাঝে পদ্যে উদ্ধৃতি আছে। প্রাচীনতর উপনিষদগুলির কিছু কিছু ব্রাহ্মণ অংশের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল

এবং প্রধান প্রধান উপনিষৎগুলিরও রচনাকাল গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ ঘটে ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি। অতএব বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্ব ধরা যায় ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। Dr. winternitz তাঁর History of Indian Literature-এ লিখেছেন ২০০০ থেকে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব ব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের সূচনা ঘটে।

বৈদিক মন্ত্রগুলি স্তোত্র বা ধর্মসংগীত এবং এগুলি রচিত হয় নানা শতাব্দীর ব্যবধানে। সেগুলি 'সংহিতা' আকারে সংকলিত হয়। মন্ত্রগুলি প্রকৃতি উপাসনার অভিব্যক্তি। এগুলিতে অগ্নি, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি উপাস্য দেবতা রূপে বন্দিত। এঁদের দ্বারাই বিশ্বজগৎ শাসিত ও পালিত। অগ্নি ছিলেন ভারতে আর্য-অধিকারের পূর্ববর্তী, কিন্তু উষা পরবর্তী। বৈদিক দেব-দেবীর (Pantheon) পরিবার বৃহৎ। বরুণ ও ইন্দ্র ছিলেন প্রধানতর দুই দেবতা। বরুণ ছিলেন চরিত্রবলের দেবতা— "essentially a god of righteousness and is the guardian of all that is worthy and good" তিনি সর্বজ্ঞ। মানুষের সব পাপই তিনি দেখতে পান এবং যথার্থ অনুতপ্তকে তিনি ক্ষমা করেন। তাঁর উদ্দেশে তাই অনেক স্তোত্র আছে। পৌরাণিক যুগে তাঁর এই মহিমা কিন্তু ক্ষীণ হয়ে গেছে। সেখানে তিনি শুধু সমুদ্রের দেবতা। তখন ইন্দ্র হন দেবরাজ। তারপর মহিমা কমে যায়। এইভাবে পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে। কিন্তু ভারতীয় উপলব্ধিতে বরুণ দেবতার সঙ্গে যে সুমহান আদর্শের যোগ ছিল, সে-আদর্শের ক্ষয় হয়নি।

'ঋত' বা সত্য-ই ছিল ভারতের দিব্যভাবনার আদর্শ। বিশ্বশৃঙ্খলা সত্যাশ্রয়ী। তাই দেবতাদের লক্ষ্য ছিল যাতে বিশ্ব সৃষ্টিতে স্থূল ভৌত বা নৈতিক কোনো বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেদিকে সক্রিয় থাকা। বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন ঋত-পালক 'guardians of rta'। প্রাচীনতর মন্ত্রগুলিতে জগৎ শুধু যে দেবতাদের দ্বারা শাসিত দেখানো হয়েছে, তা নয়,—তাঁদের দ্বারাই জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। মানুষ সম্পূর্ণ

রূপে দেবনির্ভর। বৈদিক আর্যেরা দেবতাদের 'পিতা', 'ভ্রাতা' সম্বোধন করেন। প্রেমের আকর্ষণই মানুষকে দেবতাদের অধীন করে রেখেছে সে যুগে। দেবতারাও মানুষের উপাসনায় প্রসন্ন হন প্রার্থনার মন্ত্রগুলিতে ঐহিক জীবনের সুখ-সম্পদের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। জগৎ মিথ্যা, একথার ইঙ্গিত মাত্রও নেই। আত্মার অমরত্ব স্বীকৃত কিন্তু transmigration-এ বিশ্বাস দেখা দেয়নি। তবে পুণ্যকারীর স্বর্গলাভ হয়—দেবতাদের সঙ্গে তাঁরা আলোকজগতে বাস করেন আর পাপীরা যায় ঘোর অন্ধকারে। এই আলো-অন্ধকারের বৈষম্য সুস্পষ্ট। শ্রীঅরবিন্দ এসব কথা ভেবেছেন এবং আরো প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কথাও।

পরবর্তী পর্বের স্তোত্রগুলিতে এবং ব্রাহ্মণ-অংশে mono-theism, monism এবং ritualism এই তিন ধারায় মানুষের ভাব-ভাবনা এগিয়েছে। একদেববাদ বা মনোথিজ্‌ম' এসেছে সকল দেবতার দ্যুতি বা আলোকিত রূপের সমধর্মিতার লক্ষণে। তাঁরা শৃঙ্খলা রক্ষায় আগ্রহী এবং পুণ্যকর্মের অনুকূল। কিন্তু কোনো পরম বা শ্রেষ্ঠ দেবতার ধারণা সুস্পষ্ট ধারণা দেখা দিতে আরো সময় লেগেছে। সব দেবতাই 'বিশ্বকর্মা' অর্থাৎ সর্বশক্তিমান। এই ধারায় চলতে চলতে ঋগ্বেদেই এক স্তোত্রে একথা ব্যক্ত হয়েছে যে, কোন্ দেবতাকে আহুতি সমর্পনীয়? উত্তরে দেখা যায়—প্রজাপতিই হলেন সকল সৃষ্টির প্রভু। তিনি ন্যায়ধর্ম ও সার্বিক শুচিতার প্রতীক। পরবর্তী মন্ত্রসমূহে ও ব্রাহ্মণে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। কিন্তু পরে আবার তাঁর পূর্বোক্ত মহিমার পরিবর্তে তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা 'ব্রহ্মা' নামে বন্দনা করা হয়েছে।

অদ্বৈততা বা 'মনিজ্‌ম' এক দার্শনিক চিন্তা যা ঋগ্বেদেই দেখা যায় 'তৎ একম্' উক্তিতে। আদিতে ছিলেন সেই এক যিনি being ও নন, non-being ও নন —যিনি শান্ত, আত্মমগ্ন এবং তাঁরই মধ্যে নিহিত ছিল তপঃ যা থেকে সর্বরিশ্ব, সকল দেবতা উদ্ভূত হন। তাঁরই শক্তিতে সব কিছুই বিবর্তিত।

শ্রীঅরবিন্দ এই তপঃশক্তির উদ্বোধন সূত্রেই মানুষের দিব্য রূপান্তর সম্ভব বলে মেনেছেন।

দাবীদার

শিশির গুহ

কালোকে বললো সাদা
ভাগ
সর সর দূরে থাক।
সাদাকে বললো কালো
ভাই
এটা আমাদের দেশ
থাকবো তো আমরাই।
সাদা বলে-আবে ছিঃ ছিঃ রামো
তোমরা নিগার কালো চামড়া
শ্বেতাঙ্গই প্রভু
শাসন করবো আমরা।
কালো বলে সেকি! তবে কেন তোমার আমার
রক্তের সব রং লাল
দূর হটো, ছাড়ো আমার স্বদেশ
দেখছোনা বিক্ষোভ উত্তাল।
প্রিটোরিয়ার হাতের চাবুকে
ফুঁসছে যে মহাকাল
লড়ছে জীবন, সূর্য্য আনবেই
আজ এক্ষুণি নয়তো কাল।

□

ছড়া

অনন্ত মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

সার ডিজেলের দাম বাড়ালি
বীজ কুথা রে বাজারে?
গদী লিয়ে অং-তামাশা।
ক্যামন তুরা রাজা রে।

একশো পঁচিশের রবি

শিবানী চক্রবর্তী

আর পাঁচটা শিশুর মতো সেও একদিন
এই পৃথিবীর আলো দেখেছিল সহর্ষ কান্নায়
বাপ মায়ের অষ্টম ছেলে বলে সাদামাটা শাঁখের আওয়াজ
শুধু নিয়মরক্ষা করেই একসময় থেমে গিয়েছিল
জন্মলগ্নে বিধাতা তার কপালে কি লিখে দিয়েছিলেন
তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামায়নি কোনদিন
সবাই জানে, জমিদারের ছেলে, মোটামুটি একটু লেখাপড়া শিখে বাপের
জমিদারী দেখবে
বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার গড়বে।
না স্কুল কিন্তু ছেলের ভালো লাগে না,
বাড়ীতে মাষ্টারমশাই এলেই গায়ে জ্বর আসে
শুধু ছোট ছোট স্বপ্নগুলো ছবি হয়ে ফোটে কল্পনার রঙে
কবিতার হাতছানি বৈকালের পুবাকাশে রামধনু রঙে।
অনেকে মনে একটু দুঃখ অনুভব করেন ওই লাজুক ভীরু ছেলেটার
কথা ভেবে,
সবাই জানতো, বড় বাড়ীর বড় ঐতিহ্য হয়ত ওর কাছে মূল্যহীন
হয়েই থাকবে চিরদিন
কিন্তু কেউ যেটা জানতো না, সেটা ছিল গোপনে
অসম্ভব সম্ভাবনা বিধাতার মনে
সেই অখ্যাত অজ্ঞাত শিশু একদিন ক্রমে,
যৌবনের পূর্ণতায় মধ্যাহ্ন গগনে।
সোনালী কিরণছটা ছড়ায়ে ভুবনে
সাহিত্যের নানাদিকে—কবিতায়, গানে
সেদিন সে বিশ্বজয়ী, সকলের কবি—সে বিশ্বকবি
অমরাবতীর চিরঅমর, চিরশিশু, চিরভাস্বর
সেই একশো পঁচিশের রবি।

রাভা মেয়ে মীনা

মূলকাহিনী ঃ মাধব ভট্টাচার্য
কোচবিহার লোকভাষায় (রাজবংশী)
অনুবাদ ঃ করুণা কান্ত রায়

[কোচ বিহার জেলার একটি বড় জনগোষ্ঠী হল রাজবংশী। রাজবংশীদের মুখের ভাষা দিয়ে বর্তমান গল্পটি অনুবাদ করেছেন করুণা কান্ত রায়।

করুণা কান্ত একজন রাজবংশী যুবক। কোচবিহার জেলার বোকালীর মঠ গ্রামে আজন্ম বাস। বি, এ পাশ করে সম্প্রতি একটি সরকারী অফিসে চাকরী করছেন। সাহিত্যে করুণা কান্তের অনুরাগ ছোটবেলা থেকেই।]

দেখা-দেখি, তারপর চেনা-জানার পরিচয়টা হুইচে মহাজাতি সদনত।

বঙ্গ-সংস্কৃতি উৎসব হবার ধরচিল। সাতদিন ধরি সেই উৎসব। উৎসবের শ্যাষের দিনত ছিল রাভাদের নাচ গান। ঘরটাত মেলা লোক। নাচ-গান ছাখার জন্য লোকজন যেন উপছিয়া পড়ছে। সেদিন জলপাইগুড়ি রাভা কৃষ্টি পরিষদ—উমার নাকচিনরিনী নৃত্যগীতটি পরিবেশন করলেক।

সেই নাচ গান দেখার জন্য সেদিন গৌতমও ছিল। ইউ-

নিভারসিটির ভাষা সাহিত্য বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র গৌতম। রাভাদের লোকগীতি এর আগত সে অনেক শুনলেও এইটক, এমন চমৎকার, নাচ-গানের অনুষ্ঠান কোনদিন ছাখে নাই। গৌতমের মনত আর চকুত তখন ভাসির ধরচে সেই মেয়েটার নাচ আর গান—

"ফালাকাটিং পালাওনা ফালাকাটিং পালাওনা
শিংগিমারিং ছু ছু আনা
শিংগি মারিং ছু ছু
ছু ছু তু মান ছু পালাও মান
চিকাজোড়া খাসামা আয়
নাকানজো তেইয়া
পানামারে তেইয়া...."

গৌতম গানের অর্থ না বুঝির পাইলেও গানের সুরে, গানের ভাবে একেবারে মগ্ন হয়া গেইচে। গানের আসর ভাঙ্গি যাওয়ার পর গৌতম গানের অর্থটা জানিবার জন্য মনে মনে ঠিক করিলেক যে, যে মেয়েটা ওই গানটা গাইচে—তার সঙ্গে দেখা করিবে। তাই ঘরের ভিতিবা মণ্ডপের দিকে যাবার রাস্তাত ওই মেয়েটার জন্য গৌতম বাচ্চায়া রইলেক।

গান শ্যাষ হবার পর মীনা আর তার গীদালি বন্ধুগণ সহ গীদালিদের ঘরত আসিয়া বসিলেক। এমন সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য বাহবা পায়া মীনার মনটা যেন কেমন উরাং পাইরাং করির ধরচে। বাবা যদি এগুলা শুনিলেক হয় কত না আনন্দ পাইল হয়। বাবার জন্যই আজ সে এত বড় সম্মান পাইলেক।

রাভা সংগীত ঘবনার ধীরেন রাভা একজন মাতব্বর একজন মহাজন। বছর খানেক আগাত মীনার বাবা মরিয়া গেইচে। মীনারা ছয় বইন। মীনার সবার চায়া বড। মীনার বাবা মীনাক কইত "রাভাদের আপনার কৃষ্টি আব সংস্কৃতির সব ঐতিহ্য শ্যাষ হবার ধরচে। তোমরা সগায় মিলিয়া আমাদেব

এটাকে বাঁচেয়া রাখিবার চেষ্টা করিস।"

বাবার চেষ্টায় আর উৎসাহে মীনারা আজ এত বড় হইচে। মেয়ে কয়ট্যাক নিয়া ধীরেন রাভা জলপাইগুড়ির নিজের বাড়ীত রাভা কৃষ্টি পরিষদ গড়েয়া তুলিলেক। বাবা মরিবার পর মীনাই দলের দলনেত্রী হয়া দল পরিচালনা করিবার লাগিলেক। আজি এই যে অনুষ্ঠান কলিকাতায় হইলেক এটা মীনার প্রথম অনুষ্ঠান।

হল ঘর থাকি যখন সবলোক বিড়িয়া আসিলেক তখন গৌতম হলের ঘরের ভিতরত গীদালরা যেখানে বসিয়া আছে সেই গীদালি ঘরত আসিয়া মীনাকে খুঁজিয়া পাইলেক।

গৌতম মীনাক নিজের পরিচয় দ্যায়। তারপর আজিকার এই ভাল্ অনুষ্ঠানের জন্য ওয়াক ধন্যবাদ ও সাবাসি জানায়।

একজন অচেনা যুবকের সঙ্গে কথা কইতে মীনা খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খায়া গ্যাইলেক কিন্তু যুবকটির কাছ থাকি প্রশংসা পায়া উয়ার ভারি মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিলেক।

গৌতম মীনাক কইলেক "তোমার সাথে খানিক কথা কবার চাং। আপত্তি নাইত?" লাজবতী মীনা কইলেক, "কন, কি কবার চান।"

গৌতম কয় আজিকাব এই অনুষ্ঠানে তোমাব গাওয়া ফালাকাটিং পালাওনা গানখানের মোক অর্থ বুঝিয়া দেওয়া যাবে।"

গৌতমেব কথা শুনিয়া মীনা হাসিয়া ফ্যালাইলেক। মীনা কয় "মুইতো বাংলা জানং না।" গৌতম কয় যতকুনা পান অতকুনায় কন্।

মীনা যতকুনা পাইলেক কইলেক। সেটার মানে হইলেক এইঢক —সখীরা সগায় মিলিয়া গেইচে মাছ ধরিবার। মাছ ধরতে ধরতে একজন আর একজনকে কয় সাগয় মিলিয়া হাটত যায়া আমরা মাছ বেচামু। একভাগ রাখিয়া দিমু খাবার জন্যে আব

একভাগ দিয়া গুয়া পান কিনিমু। এইটক করি আলাপ করতে করতে বেলা ডুবি গেইলেক। আকাশত দেখা যায় বগা গুলা উড়ি যাবার ধরচে। সখীর দল ক্যালম্যাল করি কইতে কইতে বাড়ী আসিবার ধরচে। এইদিকে সাঝ হয়া আসিলেক।

এইটক করি কয়া মীনা চুপ হয়া গেইলেক। তারপর সে কইলেক আর মুই কিছু কবার পাইম না। মীনার চালচলনে কথায় বার্তায় গৌতম খুব সন্তুষ্ট হইলেক। এই সময় আর খানিক কথা কইলেক মীনাকে। মীনার কাছ থাকি গৌতম রাভা ভাষা শিখিবার চায়।

মীনা কয় "সেটা ক্যাং করি হবে। দুকুনা একেনা কথা শুনিয়াতো রাভা ভাষা শেখা যাবে না। তাছাড়া মুই থাকং জলপাইগুড়িত তোমরা থাকেন কলকাতাত। ক্যাং করি শিখবেন ?"

গৌতম কয়—" মুই জলপাইগুড়ি যায়া শিখিয়া আসিম।"

গৌতমের কথা শুনিয়া মীনা হাসিয়া উঠিলেক। ডিনার সঙ্গীরাও হাসিয়া ক্যালাইলেক। গৌতমও হাসিলেক। কিন্তু মীনার বাড়ীর ঠিকানা উনায় নিয়া সেনে ছাড়িলেক।

এইটক বয়সের সময় এইটক হবারে পায়। একে ঢকের বয়সের বন্ধুদের মধ্যৎ থাকি যেমন কাড়িয়া নিবার পায় তেমনি দিবারও পায়। মনত কিছু না রাখিয়া এ্যাং করিয়ায় মীনা এবং গৌতমের পরিচয় হয়। ঐ রাত্তিতেই মীনাঘর বাড়ী ফিরিয়া গেইলেক।

কলেজত পড়তে পড়তেই মীনার পড়া বন্ধ হয়া গেইচে। হঠাৎ করি মীনার বাবা মরি যাওয়ায় সংসারে টাকা পাইসার অভাব দেখা দিলেক। রাভা কৃষ্টি পরিষদের জুয়ান চ্যাংরা চেংরিগুলাক নিয়া নাচগানের তালিম দেয় মীনা। একদিন

দুইদিন করি অনেক দিন হয়া গেইল। একদিন ছচাং করি গৌতম আসিলেক জলপাইগুড়ি মীনা ঘরের বাড়ীত।

মীনাতো গৌতমক দেখিয়া চিনবারে পাইলেক না। যখন চিনিবার পাইলেক তখন অবাক হয়া মীনা উয়ার মুখ দিয়া কিছুই কবার পায় না।

গৌতম কইলেক—"দেখচেন তো মুই ছচাং করি আসিলুং! এবারে মোক ভাষা শিখি দেওয়ায় যাবে।"

মীনা, মীনার মা বোন সগায় গৌতমক দেখিয়া অবাক হইলেক। মীনা আর তার বইনি শান্তা গৌতমক নিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোরে রাভা লোক সংগীতের খানিক খানিক যোগাড় করতে সাহায্য করিলেক। অল্প কয়দিন হইলেও রাভাদের ঘর সংসারের ছবি কাচতে থাকিয়া দেখার সুযোগ হইলেক গৌতমের।

গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তার ধারত মাটি থাকি খানিক উচাত খুঁটির উপরাত দাঁড় করা সুন্দর কারুকাজ করা একটা ঘর দেখিয়া গৌতমের কৌতূহল হইলেক। সে মীনাক কইলেক ঘরটাতো খুব সুন্দর, এটা কার ঘর।

মীনা কইলেক এটা কারও বাড়ী নোঁয়ায় তারপর হাসিয়া কইলেক ওটা তোমার ঢক চ্যাংরাগুলার জন্য তৈরী হইচে। রাভা ভাষায় এ বাড়ীর নাম—"নকসা নগৌ" এখানে "ভারাও গদা" আর "ভারাও পমর" থাকে। গৌতম মীনার কথা কিছুই বুঝির না পায়া উয়ার মুখের দিকে চায়া রইলেক।

মীনা কইলেক এখন আর কাঙয় থাকে না। তবে কিছুদিন আগত থাকা খাইচে, তারপর বুঝাইয়া কইলেক রাভাবা স্বজাতির বায়রা বিয়াও করের পায় না। যে সমস্ত রাভা চ্যাংরার বিয়ার হাউস করত সংসারী হওয়ার আগত তাদের পরের গোড় থাকি শিক্ষা নেওয়া থায়।

শিক্ষা না নিয়া কাওয় সংসারী হবার পায় না। যায় শিক্ষা দেয় রাভা ভাষায় তাকে কওয়া হয় "তারাও পাড়ে।" খানিক বেশী বয়সের রাভা যুবকদের কওয়া হয় "তারাও গদা" আর উয়ার চায়া খানিক কম বয়সীদের কওয়া হয় "তারাও পমর।" মীনা কইলেক এখন অবশ্য এই বাড়ীটা এখানকার যুবক ছেলেদের ক্লাবঘর হিসাবে ব্যবহার করে। মীনার কথা শুনিয়া গৌতম বেশ অবাক হয়া গেইলেক। সে কইলেক এতো দেখচুং খুব মজার ব্যাপার।

গ্রামের মাটিয়া রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গৌতম মীনাক কইলেক মীনা রাভাদের একটা বিয়ার বাসর মোক ভাখেবার পাবু। মীনা কইলেক বিয়াও না হইলে আর বিয়ার বাসর কেমন করে দেখাইম কও দেখি। এখন এই সময়ের বিয়াও আছে কিনা মুই জানং না। গৌতম কইলেক তোমারলার বিয়ার যে আচার নিয়ম মন্ত্রপাঠ এগুলো মোক খানিক বুঝিয়া কন। মীনা কইলেক মুইতো আর বিয়া করং নাই, বিয়ার মন্ত্র ক্যাংকরি কইম। আমাদের সম্প্রদায়ে বিয়ার পিড়াত না বসিলে কেউ কাউকে বিয়ার মন্ত্র করার পায় না। ওটা শুধু একজনকেই কওয়া যায়।

গৌতম মীনার মুখের দিকে চায়া হাসিলেক। আস্তে করিয়া কইলেক আর কাঁউকে বুঝি কওয়া যায় না? মীনা মাথা নাড়িলেক-"না"।

— কাঁউ যদি জানির চায়।"
— "তা হইলে ও না।"
— "সে যদি জানার মর্যাদা দেয়।"

মীনার মুখটা কেমন যেন ভারী হয়া গেইলেক। গোড়া মুখখান লাল হয়া উঠিলেক।

গৌতম কইলেক—"রাগ করলু মীনা" হ্যাঁ না কোন কাথাই কইলেক না মীনা। গোটায় রাস্তা প্রায় মাথা হেঁট করিয়া হাঁটিয়া গেইচে গৌতমের পাশাপাশি, গৌতমের নানা প্রশ্ন কইতে গেইলে একেবারে "হ্যাঁ" "না" জবাব দিতে দিতে বাড়ী ফিরিয়া আসচে।

পরের দিন গৌতম কলিকাতা ফিরিয়া গেইলেক। বাড়ী ফিরিবার সমে গৌতম মনে মনে বুঝবার পারিলেক যে উয়ায় শুধু রাভা ভাষা বা রাভাদের গান নিয়াই ফেরেনি মনের মাঝত যেন আরও কিছু নিয়া আসিবার পা রচে। বাড়ীত ফিরিবার পরেও মীনার সুদা যোগাযোগ রাখিলেক গৌতম।

হোলক পোচক মনের মতো একবার আগায় মন দুইবার পাচায়। সমাজ সংস্কারের বাধা থাকিলেও গৌতম ভালবাসার কাচত যে আস্তে আস্তে হার মানছে মীনা সেটা বুঝবার পায়।

একদিন গৌতমের সমস্ত সংস্কার ভাঙ্গি গেইলেক। সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব উড়িয়া গেইলেক সমাজের প্রথার চাইতে মানুষের ভালবাসার মূল্য বড় হয়া উঠিলেক মীনার কাচত। মীনা তার জন্মভিটা ছাড়িয়া আপনার জনদের ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেক।

গৌতমকে বিয়া করিলেক মীনা। দোসররে পাইতে শাস্ত্রের লেখা মন্ত্র উচ্চারণ করা যায় না। মীনাও করে নাই গৌতমও করে নাই। কেবল দুইটা কাগজত ওমার দুইজন সই করতে হইচে মাত্র।

একমাত্র শান্তা জানে দিদি চলি যাবে। কোনদিনও আর ফিরিবে না। অন্য জাতির সাথে বিয়া তাদের সমাজ মানিয়া নিবে না। চলি আইসবার সময় শান্তার গায়ে হাত রাখিয়া মীনা কইলেক—"রাভা কুষ্টি পরিষদ ক তুই বাঁচেয়া রাখিস্।"

বিয়াও করেয়া মীনা অধ্যাপক স্বামী পাইলেক কিন্তু তার জীবনের আসল জিনিসটাকেই সে হারেয়া ফেলাইলেক। নাচ আর গান উয়ার জীবন থাকি বহুদূর সারিয়া গেইলেক।

গৌতমের মা বাবাও এই বিয়াকে ভাল মনে নিতে পায় নাই। গৌতমক সেইজন্য বিয়ার পরেই ঘরছাড়া হইতে হইলেক। গৌতম আর সব ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইলেও নাচ গানেব কথা শুনিলে এড়ে যায়। মীনা সারাদিন এক হু হু করা শূন্যতায় ভোগে।

বাড়ী থাকি মাঝে মাঝে শান্তার চিঠি আইসে। কোন খবর পাইলেই শান্তা দিদিক লেখিয়া জানায়। যাওয়ার জন্য লেখে। মীনার মনটা আনচান করে। কত কথা চোখেব সামনে ভাসিয়া উঠে। এক একবাব ভাবে যাবে। সমাজ-সংসার যদি গ্রহণ না করে তাও যাবে। দুর থাকি উয়ায় দেখিবে শান্তার পরিচালনায় বাভা কৃষ্টি পরিষদ কতটা বড় হইচে। ভাবে কিন্তু যাবাব পায় না। শুধু কি সমাজের বাধা, বাধা গৌতমের কাচ থাকি ও আছে।

মীনা গৌতমক শান্তার চিঠি দেখায়

গৌতম কয় "কী করবু।"

মীনা কয়—"যাবার চাং।"

গৌতম বাধা করে। কয় থাকুক। "ঐ জীবনটাকে তুই ভুলিয়া যাবার চেষ্টা কর।"

গৌতম চায়না মীনা আরও উয়ার আগের জীবনটাক ফিরিয়া পাউক। ওটা নিয়া উয়ায় ভাবে। উয়ায় ধুশুদণ্ডবালী ঘবের গৌতমের বউ হয়া থাকুক।

গৌতমক বিয়া কবেয়া এতটা পরের অধীন হবে মীনা ভাবির পায় নাই। গৌতমের কথাত উয়ায় মনত দুঃখ পায়।

বছর ঘুরিয়া গেইচে। মীনা মানি নিবাব চেষ্টা করে উয়ার এই বন্দী জীবনটাক। মাঝে মাঝে হাপেয়া ওঠে। কলিকাতা শহরের ছোট খুপুরীর মতো ভরা করা ঘর, মাপা-জোকা জল, এত্তোকুনা আকাশ, জীবন ধারনের জন্যেমাপা বাজার, মাপা কথা, এলার্ম বাজেয়া ভোর রাইতে ঘুম থাকি উঠা, উনান ধরেয়া

গৌতমের কলেজের রান্না করিয়া খাওয়ান, প্রাণহীন ঘরত দিনভর সংসার গোছা এ সবতে আস্তে আস্তে মীনা অভ্যস্ত হয়া উঠিলেক।

গৌতম দুই তিনটা কলেজের ঢোকা দেওয়ার মত কাজ (পার্ট টাইম করে অনেক রাইতে বাড়ী ফিরিয়া আইসে। তারপর রাত্তি যখন ভালেটা হয় তখন গৌতম লোকসংস্কৃতির উপর গবেষণামূলক কাজ করে।

মাঝে মাঝে এই জীবনটাব জন্য মীনার মনটা তিতা হয়া যায়। শান্তাই জলপাইগুড়িব সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পন্থা। শান্তা মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেয়।

কয়দিন বাদে শান্তার একটা চিঠি পাইলেক। সেই চিঠিতে শান্তা লেখচে বাভা কৃষ্টি পরিষদকে নিয়া উমরা সগায় মিলিয়া দিল্লীতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিবাব যাবে। ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিবাব জন্যে শান্তা উয়াব দিদিকে কাকুতি মিনতি করচে। উমার গ্রামের সগারে ইচ্ছা মীনা এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করুক। এইটক সুযোগ বাভা কৃষ্টি পরিষদের ভাগ্যে এর আগত কোনদিন জোটে নাই।

হাওড়া থাকি ১৩-ই আগষ্ট রাত্তি বেলাব কালকা মেল ধবিয়া উমবা সগায় দিল্লী যাবে। শান্তা মীনার জন্য টিকিট কাটিয়া রাখিবে বলি জানাইচে। মীনা চিঠিখান পড়িয়া আনন্দে উত্তেজনায় বসিয়া পড়িলেক। দিল্লীত যাবার ধরচে অনুষ্ঠান করিবার জন্যে—এটা মীনাব কাচে বড় গৌরবের।

গৌতম যখন বাড়ী ফিবিয়া আসিলেক তখন মীনা শান্তাব চিঠির কথা কয়া চিঠিখান পড়িবার জন্যে গৌতমেব হাতত দেয়। গৌতম চিঠি পড়িয়া চুপ করিয়া রইলেক। কিছুই কইলেক না। ১৩-তাবিখ আসিবার আগত আরও দুই একদিন মীনা গৌতমক দিল্লীর কথাটা কয়। গৌতমকও দিল্লীত মীনাদের সাথত যাবাব কয়। গৌতম যাবার জন্যে বাজী হইলেক না মীনাকও যাবার বারণ করিলেক। দুঃখে অপমানে মীনা কুঁকড়ি গেইলেক। উয়ার ভালবাসার স্বর্গটা হঠাৎ কৈরিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেক।

ভাঙ্গি যাওয়া মন নিয়া মীনা শুধু কয় এইটক তোমার ভালবাসা। গৌতম কিছুই কবার পারিলেক না। মীনার গোড হইতে উঠিয়া চলিয়া গেইলেক।

গৌতমক মীনা ভালবাসে। আবার গানেব মধ্যে উয়াব জীবনেব সুর বাজে। সবকিচু হারেয়াও গৌতমেব ভালবাসার মর্যাদা উয়ায় দিচে, কিন্তু গানকে এমন করিয়া হারেবার চায় নাই উয়াব কোনদিন। আজিও চায় না।

হোলক পোচক মনের জ্বালায় মীনাব দিন কাটিব ধবচে। ১৩-তারিখের সাঁঝে মীনা ভয়ে ভয়ে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইলেক। বাড়ী থাকি বিরিবার সময় গৌতমক একখান চিঠি লেখিয়া দিয়া আসিলেক।

হাওড়া ষ্টেশনে শান্তা ঘরের সাথত দেখা হইলেক। দলের সবাব সঙ্গে দেখা হইলেক। দলত ফিব কয়েকজন নয়া নয়া লোকও আসিচে। সগায়গুলা মীনাক দিল্লীব আসরে যাবার জন্যে খুব করিয়া কইলেক। মীনা উমারগুলার গর্ব। মীনাক ছাড়া উমার আসর চলে না।

মীনা কি যে কবিবে কিছুই বুঝিবার পাবার ধরচে না। ভাবিবার মত মনের অবস্থা উয়ারও ছিল না। সগারে সাথে উয়ায় কালকামেলে উঠিয়া বসিলেক।

পৃথিবীর মাটি কাঁপেয়া রাতের বেলার মেলগাড়ি দৌড়িয়া যাবার ধবচে। ঘুটঘুটা আন্ধার রাত্তি মাঝে মাঝে আলেয়ার ঢক দুই একটা আলো ভাসিয়া উঠে ফুৎ করিয়া স্টেশনগুলি হাবেয়া যায়।

যাইতে যাইতে মীনার মনে হইলেক এইটক করি একদিন রাইতেব এক্সপ্রেস গাড়িত চাপিয়া জলপাইগুড়িক বিদায় জানেয়া আসিচে। তাব জন্মভিটা আর উয়ার মা বইন সগাকে ছাড়িয়া দোসরের টানত ছুটিয়া গেচিলেক বহুদূরে। আর আজি নিজের গানের টানে দোসরক ছাড়িয়া উয়ায় যাবার ধরচে আর এক সদূরে।

মীনা চোক মুজিয়া একবার ভাবিলেক। সচাং সচাং কি গৌতমের গোড় থাকি উয়ায় কি দূরে সারি যাবার ধরচে? গৌতম কি উয়াক বুঝিবে না?

পুঁটিয়া

কাকলি ভট্টাচার্য

[মেদিনীপুর জেলার ভাষা বৈচিত্র্য বেশ অদ্ভুত। যেমন দীর্ঘ আয়তনের জেলা, লোক সংখ্যাও প্রচুর-লোক সংস্কৃতির ধারাও বিচিত্র। এখানকার মানুষের ভাব বিনিময়ের ভাষাতে রয়েছে নিজস্বতা। একমাত্র কাঁথি মহকুমা অঞ্চলের মানুষেরাই ৬ রকমের ভাষার ব্যবহার করে থাকেন। স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্তন। একটি থানা এলাকা পেরিয়ে অন্য একটি থানা অঞ্চলে ঢুকলেই ভাষারও পরিবর্তন ঘটে গেল।

আরও অদ্ভুত হলো, জাতপাত হিসেবে ভাষার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র জাত বিশেষে ভাষার ব্যবহার আলাদা আলাদা। 'পুঁটিয়া' গল্পটি রচিত হয়েছে কাঁথির নমাল এলাকার শূদ্রদের মুখের ভাষায়।

'পুঁটিয়া' গল্পের লেখিকা কাকলি ভট্টাচার্য জন্মসূত্রে কাঁথি এলাকারই মেয়ে। এই ভাষা বৈচিত্র্যের উপর তিনি কাজ করছেন দীর্ঘদিন। এই জেলার লোক ভাষাকে গল্পের আকারে সাহিত্যের পাদপীঠে সম্ভবত তিনিই প্রথম উপস্থাপনা করেন। এই ভাষায় তাঁর লেখা প্রথম গল্প সংস্কার 'সাহিত্য সৈকত' পত্রিকাতেই ১৯৮২ সালে প্রথম ছাপা হয়েছিল। লোক ভাষার কাজ ছাড়াও শ্রীমতী ভট্টাচার্য সাহিত্যের অন্য বিভাগেও বেশ বেশি লেখালেখি করে আসছেন তাঁর ছোটবেলা থেকেই।]

পুঁটিয়া জাতে ধোপা। সারাদিন এ গাঁ সে গাঁ ঘুরি ঘুরি সে লুগা পটার বুচ্‌কি পিঠ্‌র ঘর যখন আসিকি পৌঁছায় তখন দুফর্‌ গড়ি বিকাল হই যায়। তার বড় পোটা দুটা ভাত ফুটিকি কিছু গটে সিজিকি বাখি দেয়। পুঁটিয়া আসিকি গা ধুইকি খায়। ভুঁইবে টিকে গা পাতার সময় নাই তার। সেই লুগার বুজকি খুলিকি সে সিজিতে পড়ি যায়। আবার যদি কুন দিন জাল নাই বয়, তমুন সব পেকি দিকি পত্‌রা ঝাঁটিতে চালি যায় আড়িয়া পরকে। পুঁটিয়া একা একা কাপড় সিজায় আর নিজে নিজে বিড় বিড়কি কয়, 'আর কাপড় কাচতে হবেনি, যা সঁটার দাম বাড়ি গেলা'। টিকে পরে হাঁক মারিকি ডাকলা —'অ·····চুটিয়া, চুটিয়ারে·····। কুন সাড়া শব্দ নাই পাইকি আবার হাঁক মারলা তার সাজিয়া পোকে, 'ঝাঁপড়া, তোর দাদা কাই গেলারে? ঝাঁপড়া কইলা সে খাইকি কত খননু কুনমা পালিচে।' 'খাইমালু সবু কতগুলা জন্মহিচে, গাতপসা আইস্তু ঘরকে হবে তার সাঙ্গে।' পুঁটিয়া গজ গজ করতে করতে আগের দিন কাচা লুগার পুটলিটা হাতরে গলি দিকি পিঠরে ছাঁটি দিলা। ঝাঁপড়াকে কইলা—'চুলিরে কাপড় বুস্‌সে জাল দিবু আর ভাই উঠ্‌নে দুটা ভুজা আছে খাইতে দিবু। আমি কাপড়গুলা পানিদারে দি আসি পট্‌কি।'

পুটিয়ার সব রইবিকি কিছু নাই কইতে গলে। তার বয়ের কতরে সে রয়নি অখন। তিনটিয়া পো জন্ম হবার পরেবি পুঁটিয়া যখন বুঝতে পারলা তার বর আর গটে মায়ার কতরে যাইকি জুট্‌চে, মনটা তার বিষের মতন হিইচে তত্তদিনকু। কত কইলা, কত বুঝিলা। নাই পারিকি গলা ফাটিকি কাঁদা কাটি করিকি ঝগড়া করচে কতদিন, উল্টিকি মার খাইচে, সে, কিন্তু সে মরদ যমুন—তমুন কদিন খাটতে বি যায়নি, ঘরবি আইসেনি। পুঁটিয়া উপায়ন্তর নাই পাইকি দু-দিন পর পর

উপাসের পর তিনটিয়া পো-বং হাত ধরিকি দিনে তার মার কত্তে আইসিকি উঠলা।

সউ আসাই তার শেষ আসা। আর কুনদিন ফেরি যায়নি সে সেই ভিটাকে। পুটিয়ার মা মরি গেলা পরের বছর। তার আর ভাই-ভন্ কো নাই। সে তার মার মতন গাঁনু কাপড় আনে কাচি দেয়, দুয়ার দুয়ার যাইকি আবার দি আইসে। গাঁব লোক মনে যা দেয় তাউ দিকি কুনমতে চারটিয়া পেট চারটিয়া পেট চালি যায়।

দিনে দুফররেলা গাঁনু ফেরিকি পুঁটিয়া দেখলা দুয়ারপিঁড়াবে কে গটে বসি আছে। খবারে মথাটা ঝিম্ ঝিম্ করচে দূরনু পোইলটা চিনতে পারেনি, কোতকে যাইকি দেখলা—তার বর খুঁটারে ঠেস দিকি বুসি আছে। মলিয়া গটে কাপড় পিঁদচে, ছিঁড়া গটে জামা, কাঠির মতন রোগা হিইচে লোকটা। তাকে দেখিকি পুঁটিয়া থমকিকি খাড়া হিয়ালা টিকেক্ষণ। আস্তে আস্তে তার কতকে যাইকি কইলা, 'অতদিন পরে মনে পড়চে তাহিণে! মরিচি না বাঁচিকি বইচি দেখতে আস্স নাকি? যাকে উদ্দেশ্য করিকি ওউ কথাগুলা কওয়া হিলা, সে মড়ার মত বুসি রইলামুখটা তলয়া করিকি, কুন সাড়া দিলানি, পুঁটিয়ার মুহা বেলেবি চাঁইলানি। অন্য ধারনু কুন উত্তর আইলানি দেখিকি পুঁটিয়া আর কুন কথা ন কইকি গাড়িয়াকে চালি গেলা গোড-হাত ধুইতে। গাড়িয়াবে রইকি পুঁটিয়া তার পো-মেনকে হাঁক মারলা। গুচ্ছাতি দানু তিনজন বারি আইলা। ঘরে আইসিকি তিনটিয়া টকা তার বাপকে দেখতে রইলা চাঁই চাঁইকি। পুঁটিয়া থমকিকি কইলা—'কি দেখুটু কি, শুনি, ওউঠিকি সারকাস বুস্সে নাকি? যা, চাটিয়া পাত, জল আন আমি ভাত বাড়িটি।

চুটিয়ার বাপ গ্যাঁট গাড়িকি বুসলাত বুসলাই আর ফেরি যাবার নাম করলানি। পুঁটিয়াবি মনে মনে ভাবলা— এ বরং ভালাই হিলা। আজ মা নাই। মথার উপরে আর গটে কো নাই দেখশুন করবার। আর চুটিয়ার বাপ যদি ঠিকমত ঘরে বাহারে খাটে ছুটা পইসা ঘরে আনা যাবে। ওউ ভাবিকি পুঁটিয়া গাঁকে যাইকি এর দারে তার দাবে কাজের খঁজ করি আইসে। চুটিয়ার বাপকে কই রখনে পরের দিন ভোর বেলা পাখাল খাইকি খাটতে বারি যায় সে। নিহাত যেদিন কুন কাজ নাই পাওয়া যায় চুটিয়ার বাপ ঝড়া পাইছা শুণে নয়ত হাঁড়ি হাঁড়ি কাপড় সিজায় পতরা জাল দিকি আর পুঁটিয়া সেগুলা কাচি কাচি শুকায়। সাঁজিয়া বেলা গাঁরে দি আইসে। দিনে হাটকে যাইকি চুটিয়ার বাপ পুঁটিয়াকে গটে হালি রং এর কস্তা শাড়ি আর তিন পোকে তিনটিয়া প্যাণ্ট আনদিলা। তাউ দেখিকি পুঁটিয়া মনে মনে বোড় সুখ পাইলা। ভাবলা, ভগবান যাহাউ সুমতি করিকি লোকটাকে আনি জুটি দিচে। এ যদি ঠিক মতন খাটা খাটনি করে তাহিনে খাওয়া পরার জিন্যে আর অতটা কষ্ট করতে হবেনি।

পুঁটিয়ার মনের কথা শুনতে পাইকি ভগবান হাঁসলা প্যারে। কেনিনা, তার দিন পনর বাদে দিনে গাঁনু ফেরিকি পুঁটিয়া মথা ঘুরিকি পড়ি গেলা বাহারে। চুটিয়ার বাপ তখন ঘরে থাইলানি। লোকে দাকে খাটতে যাইথাইলা। ঝাঁপড়া ছুটি যাইকি জল আনিকি তার মাব মথারে দিলা। টিকে পরে ধরিকি বুসি দিলা দুয়ারে। কদিন বাদে পুঁটিয়া বুঝতে পাবলা আবার গটে আসেটে। ভাবি ভাবি তার মনটা বোড় খারাপ হিয়ালা। তিনটিয়াকে ঠিক মতন খুইতে দিতে পারেনি, আবার গটে আসিকি জুটনে কি হবে উপায়। যাহউ চুটিয়ার বাপ যখন রইচে ভরপেটা নাহউ আধাপেটা খুইকিরি মানুষ করা যাবে।

চুটিয়ার বাপকে ওউ কথাটা আজ কই কাল কই করতে করতে কটা দিন চালি গেলা। মনে আইলা ত মুখে আইলানি। দিনে আর চাপি নাই রখি পারিকি কই পেকিলা কথাটা। চুটিয়ার বাপ পইলা কথাটা বুঝতে নাই পারিকি ফ্যাল ফ্যালকি চাঁই রইলা পুঁটিয়াব মুহা। পুঁটিয়া অন্যমুহা মু ফেবিলিতে চুটিয়ার বাপ আস্তে আস্তে উঠিকি আডিয়াপরকে চালি গেলা। পরের দিন সকালনু উঠিকি পুঁটিয়া গাঁকে চালি গেলা ঝনকাব ঘরে ছুয়া হিচে লর্তা ভাঙ্গা হবে। চুটিয়াব বাপ তখনবি বিছানানু উঠেনি। চুটিয়াকে ডাকিকি পুঁটিয়া কইয়ালা—'আইজ আমাব ফেরতে ফেরতে বেল গডি যাবে। তোর বাপকে কইনে চাউল আনদিবে তোব মনে রাঁধিকি খাইলিবু। আমি গাঁবে খাই আসবা। চুটিয়া মথা নাডলা।

পুঁটিয়া জানে আইচ চুটিয়ার বাপ কাজে যাবেনি, ঘরে বুসি বুসি ঝডা—পাইছা গুণবে। সউজিন্যে সে আর ঘরের কথা কুন নাই ভাবিকি কাজে চালি গেলা। ফেরতে ফেরতে তার বেল গডি গেলা। কাজ সরিচে অনেকক্ষননু সাঁউতের ঘরে লয়া বউব সাঙ্গরে কথা কইতে কইতে দেরী হিয়ালা। ঘরের পিঁড়াবে উঠতে নাই উঠতে ঝাঁপড়া ছুটি আইলা কতকে, 'জান মা, বাবা না জামাটা কাঁধরে পেকি দিকি কুনমা চালি যাইচে। ডিবানু সব পইসা গুলা লিইচে।' পুঁটিয়া অবাক হিকি কইলা, 'কতবালা গেলা?' ঝাঁপড়া কইলা, 'দুফরের আগে আগে পাখাল খাইকি বারি যাইচে।' 'তোরমনে কি খাইচু'? 'আমার মনে দুটা ভুজা খাইচি।' পুঁটিয়া আর কিছু ন কইকি ঘব ভিতকে ছুটি গেলা। ডিবা অঁডলিকে দেখলা, তাঁইরে গটে বিলি পইসা নাই, ডিবা খালি। হায় হায় রে কইতে কইতে পুঁটিয়া মথারে হাত দিকি বুসি পডলা। ঝাঁপড়া ফ্যাল ফ্যালকি তার মার মুহা চাঁই রইলা। ছোট টকা মন্টু মার সাড়া পাইকি চোখ বগড়ি বগডি বিছানানু উঠি আইসিকি কইলা—'মা' ভোক পাইচে, খাইতে দে।' পুঁটিয়াব মনে হিলা গটা দুনিয়াটা যমুন চবকির মতন ঘুরতে লাগচো। তার ভরা পেট গুলি উঠলা। তার দুই চোখে আঁধার নামি আইলা। পুঁটিয়া বাহার ভলে গড়িকি পড়ি গেলা। মন্টু গলা ফাটিকি কাঁদি কাঁদি কইলা—'মা' অমা খাইতে দে, ভোক পাইচে খাইতে দে না!'

কম্‌লি

মুক্তি মুখোপাধ্যায়

[কম্‌লি' গল্পটি বীরভূম জেলাব বংকালী অঞ্চলের লোক ভাষায রচিত। রূপপুর, কসবা ও আহম্মদপুর অঞ্চলেরও কিছু কিছু শব্দ গল্পটিতে স্থান পেয়েছে।

গল্পের লেখক মুক্তি মুখোপাধ্যায় জন্ম সূত্রে বীরভূম জেলার আদিত্যপুর গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষক। বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে গণিত বিষয়ে এম. এ, পাশ করলেও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছোটবেলা থেকেই। মূলতঃ গল্পেরই লেখক। গ্রামের সাদাসিধে আটপৌর মানুষেরাই তাঁর গল্পেব ফ্রেমে ধরা দেয়।]

বংশী আচ্ছা করে বারি কতক বসিয়ে দিলে আমার পিটে। চেঁচিয়ে এসে পড়লাম আকবারে অ'ল্‌তলাতে। 'কম্‌লিরে মেরে ফেললেরে' বলে চেঁচিয়ে উটতিই বংশী গজ্জন করে উটলো, 'চুপ কর হারামজাদা হাড়গোলা গুঁড়ো করে দোব।' দিত বোধায়, কিন্তুক বংশীর বৌটো ওর হাত থেকে পাঁচনটো কেড়ে লিলে। আমি অবিশ্যি তকনও কম্‌লিকে ডাকচি। পাশেই ঠাকুর মাশাই-এর বাড়িতে পাট করতো সি। ঘাটে নেমিস্‌লো বাসন ধুতে। আমাকে পড়ে থাকতে দেকে আর চিচ্‌কার শুনে ছুটে এলো। বেটাকে চোক বাঙিয়ে বললো, আবার তু বাবাকে

মেরেচিস ? বলেই পিটে হাত বুলুইতে লাগলো আমার। দাগ-গোলা দেখে বলতে লাগলো, দেকো দিকিনি, যাত্তা দলে যেমন মিচে করে চাবুক মারে আর ত্যাল-সেঁদুরের দাগ টেনে নোককে দেকায়, তেমনি দাগ হইচে গো।

তখন পাড়ার ও দু' একটো নোক জুটেছুলো। তারা সুমুদ্দ গাল দিতে লাগলো বংশীকে, ছিঃ বাবাকে আবার মারে।

বেশ করবো মারবো, উ আমার বাবা ব্যাটে নাকি!

বংশী বোধায় জানতে পেরিস্‌লো উয়োর জন্মর কতাটো। সিদিন ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে জল হচে। সোঁতোদিন মিচিলে ঘুরে কেলান্ত হয়ে সন্‌জে থেকে ঘুমিয়ে গেইচি। ঝাঁপ পেরিয়ে খানিক খানিক জল মেজেতে ঢুকছিল, কিন্তুক খ্যাল নাই। ঘুম ভাঙলো বড়বাবুর ডাকে। মান্‌দেরি কত্তাম বড়বাবুর বাড়িতে। দু দিন যাই নাই ইষ্টাইক করে। ভাবলাম মাত্তে এলো বুজি। কিন্তু আবার ডাক, আকবারে ঝাঁপের কাচেই। ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এসে বললাম, কাল থেকে যাব কত্তা।

কত্তা উত্তর না দিয়ে বললে, সন্‌জে থেকে আতো ঘুম!

কেতো ঘুম, তুমি তো আকবার ডেকেচো।

কত্তা হেসে বললে, অসময়ের ঘুম সি মানুষকে নজ্জা স্যায়, তাই কেরু ডাকে ভাঙলিই সবাই মনে করে আকবার মাত্তর ডেকেচে। যাগ উ-কতা। বলছেলাম কি—কম্‌র্তিকে—

কি হইচে, কমলির? বলে চোখ দুটো ভাল করে রগুরে লেলাম। অপর বল্লাম, ঘরে আসুন।

হয় নাই কিচু, মানে, তোকে সি ভালবাসে জানিস?

ভাল তো আমুও বাসি কত্তা কিন্তুক—

থেমে গেলাম। কি জানি বোধায় নজ্জাই লাগলো। ছাল্লেনা বড়বাবু,—নজ্জা কিসের—বলতিই হবে—এইসব জিদ। দুজনাতে মাতা নামিয়ে ঘরে ঢুকে নস্ফটো উস্‌কিয়ে দেলাম। চোকে তখন আমার-ঘুমের নেশাটেও কেটে গেইচে, কিন্তু খোঁচা

খোঁচা দাড়িতে ঐ ঘুমের ঘোরে লাল পড়ে—মানে চ্যাট্‌চ্যাট্‌ করছুলো। চাল থেকে টোপ টোপ করে লাল জল পচ্ছিল, উই হাতে করে রগুরে লিয়ে বুলিয়ে লেলাম মুয়ের চারপাশে। কত্তা আকটো সিগরেট দিয়ে বললে, কি বলছিলি ?

আমি সিগ্‌রেটে টান মেরে মেরে ভাবচি, কত্তা আতো সদয় ক্যানে ! মিচিল কল্লাম, দু'দিন কাজে গেলামনা, বড় মান্দের বলে কতা, আমার কাজও অ্যানেক—

বড়বাবু ছাল্লেনা, শুনবিই কতাটো বল কি বলছিলি, আমার বহুত কাজ।

আগ্‌ডুং নজ্জা ভেঙ্গে বল্লাম, কম্‌লি গয়লা ঘরের বিটি, বেদবা, আমার চাইতে পাঁয় বচরের বড় হবে—

দুর উ সব বাদ দে। পিরিতের কাচে আবার ছোট বড় কি ? কম্‌লি তোকে ভালবাসে

সিগরেটটোতে আকটো জোর টান দিতে আরম্ভ করিই বলে ফ্যাল্লাম সত্যি ! বলিই সি কি কাশি। হোঁক নেগে গালো। আগড়ুং সামলাইতিই বড়বাবু বললে, তোকে আর কাজ কত্তে হবেনা, কম্‌লিকে লিয়ে পালা আজই রেতে।

অ্যাঁ !

পকেট থেকে টাকা বার করে নম্ফর আলোয় গুনে দেকালে পাঁশ্‌শো রইচে। আমার হাতে দিয়ে বললে, এইটো লে, আর কম্‌লিকে লে লিয়ে পালা।

আমি তো অবাকের ওপর অবাক। ই কি ব্যাপার ! শুন্‌ইতিই বড়বাবু বল্লে কম্‌লি নাকি তিনমাস। যে বড়বাবু খালি খালি চোক রাঙাইতো—তার সেই চোকে সিদিন কি ভয় ! বল্লে, কম্‌লিকে লিয়ে আসচি, কিচু কাপড় চোপড়ও দোব। আকটো চিটি লিকে দিইচি, আদিমপুরে গোপে বামুনকে দেকাস, সব বেবস্তা করে দেবে।

বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলাম, উ ভাবচে যুগটো পালটিয়ে গেইচে,—ছোট নোকরা জোর করে বিয়ে দিয়ে

দেবে, তাই কেমন নরম হয়ে আইচে আমার কাছে। এই সময় আরও কিচু—

কি ভাবচিস বুচো ?

হেঁ হেঁ, বলতে ভুলে গেইছেলাম, আমার নাম এঁজ্ঞে বুচো মাল। তা যাগ্‌ উ সব। বললাম, বড়বাবু উয়োতে হবেনা, আরও কিচু দেন।

বড়বাবু সঙ্‌ঙে সঙ্‌ঙে আরও দু'শো টাকা দিয়ে দিলে।

কম্‌লিকে লিয়ে সেই রেতিই বেরিয়ে পল্লাম কাপড়ের পুঁটুলিতে টাকাগোলা বেঁদে। আদিমপুর ইয়ের এগুতেও দু' আকবার গেইচি ঐ গোপে বামুনের বাড়ি, বড়বাবুরই কাজে। সেই রাস্তাই ধরলাম। সাবা রাস্তা আমাদের কতা নাই। শুদু হাঁটচি আর হাঁটচি। মনে পড়তে নাগলো এগেকার কতা গোলা।

আমি ন্যাংটো থেকে বড়বাবুর বাড়িতে মান্দের ছেলাম। গরু চরাইতাম ; ছানি কাটা, জল তোলা, গরুকে খেতে দ্যা এইসব কত্তাম। তা'পর বড় মান্দের হয়ে হাল বইতে শেকলাম। পনের বচরের মরদ হলাম। খ' বেড়ে গালো—মোটা হতে নাগলাম। কিন্তুক সেই যি ছোট থেকে ছানি কাটতে কাটতে ছানিকাটা চালায় ছানিব গাদাতেই শুয়ে ঘুমনো অব্যেসটো হইছুলো সিটো আকবারে গালোনা। ছোট বেলায় গিন্নীমা রা যতই ডাকতো 'বুচো বুচো' বলে, আমি সাড়া দেতাম না। মন হতো রা দি, কিন্তুক ক্যানে যি দিতে পাওামনা বলতে লাববো। বড় মান্দের হয়ে সিটো ঘুচে গালো। ইমন সময় দেকি বেদবা কম্‌লিকে দয়া করে বড়বাবু ঘরে লিয়ে এলো। সোন্দর চ্যা-রা। টুকটুকে রঙ। গয়লাদের বিটিছেলে। কুড়ি বছর হবে। আচ্ছাই যৈবন। কাপড়েব ভেতর থেকে রঙ ফুটতো, মনে হতো পাত্‌লা পাত্‌লা ম্যাগে ঢাকা পূন্যিমা

রাস্তা। মুড়ি ভাজতো, কাপড় কাচতো, তরকারি বনাইতো, বস্তা বাঁটতো—কত কি। বায়োরে ওড়া খড়ের চালের মতন চুলগোলা দু গালের পাশে উড়তো. দারুণ কাঁপতো আমার ভেতরটো উসব দেকে। বড়বাবু উয়োকে সুবাস ত্যাল কিনে দিলে, কাপড় কিনে দিলে ছাপঅয়লা। তাবে বড়গিন্নীমা খুব গাল দিত। কি জানি বড়বাবুর সনে ফষ্টিনষ্টি কতো বোধায়। শুযে গোবর সানা, ঘুঁটে ত্যা. ঘুঁটে ছাড়ানো—মেলা, এইসব করাইতে নাগলো। কমলি কাঁদতো মাজে মাজে। আমার খুব ময়া হতো। উয়োর বাইরের কাজগোলা, যেমন—গোবরের কাজ, কাপড়কচার কাজ সব লুকিয়ে লুকিয়ে কবে দিতে নাগলাম। গিন্নীমা খোঁটাও দিত। রাতদিন রেড়ুয়া শুনতো. ছাবি দেকতো বেড়ুয়াতে আর আমার বগব দেখতো। বলতো, উয়োকে কোতাও পাটিয়ে দিতে পারিস বুচো ?

আকদিন কমলিকে খুব কাঁদতে দেকে বেদম জোরে নিশ্বেস লিয়ে বলে ফ্যাল্লাম, তুমি কাঁদ ক্যানে আমি তো আচি। আর বলাও যা ইমনভাবে কমলি আমার দিকে তাকাইলে—

সিদিন আমি বুজে ফ্যাল্লাম কমলি আদশ্য হিন্দু লারী। উয়োকে টলানো সোজা কতা লয়।

কিন্তুক ধারনাটো দু'দিন পরে ঘুচেও গালো। সিদিন পঞ্চমী। হিন্দুঘরে হাল বন্দ। র‍্যাতে দু'টো ভাত দিয়ে গ'ল ঘরের পাশেই ছানি কাটা চালায় ঘুমিয়ে গেইচি। হটাৎ ফুসুর ফুসুর শব্দে ঘুমটো ছিঁড়ে গালো। ত্থা-লে আকটো ফুটো ছুলো. সিদিক দিয়ে চেয়ে দেকি গ'ল ঘরে বড়বাবুর সনে কমলির কত কথা। হাত ধচ্চে পা ধচ্চে—আর ও কত কি, লজ্জার কতা সিসব। খুব রাগ হলো। কমলিকে কেউ লষ্ট করবে ই কতা ভাবতে আমার ভাল নাগেনা।

দু'মাস পেরুইলো। আরও এই রকম দিশ্য ত্যাক্‌লাম। ঘেন্না হলো কমলির ওপরে। সি যত লতুন লতুন কাপড় পরে,

হেসে খেলে বেড়ায় ততই ঘেন্না লাগে আমার। ভাবলাম, মরুগ্‌গে, আমার চাইতে কত বড়—কম করে দশ বার বছর তো ব্যাটেই। তেমু থাকতে লারলাম। আকদিন বললাম, কমলি দিদি, তোমার কাজ আমি আর করতে লারবো। তোমার রূপ আলা ছিটুইচে পিতিমীতে আর আমি ভেবে ভেবে—

তা তু কি বলতে চাস কি বুচো। বেটা মালেদের ছোঁকরা আবার রস কত? মাল্লা দুলিয়ে চলে গালো কমলি।

বচর ঘুরে গালো। আবার বষ্যা এলো। চাষ নাগলো। কিন্তুক ঝামেলা নেগে গালো মুনিষে আর মুনিবে। বিকেল বেলায় ঢোল পড়লো, ছুল্লো খাটলে দিন বার টাকা দিতে হবে, লইলে কাল থেকে ইষ্টাইক। ঝি, মান্দের, মুনিষ সব বন্দ।

হলোও তাই। পরেব দিনেই বেরুইলো মিচিল। আমাকে টেনে বার করে লিয়ে গালো। কমলিকেও লিতে এলো, বড়বাবু তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে, কিন্তুক কমলি গালোনা। আমুও দু'দিন খেতে পেলামনা তেমুও কাজে গেলাম না। শ্যাষে বেতের আঁদারে বড়বাবু এলো আমার কুঁড়েতে যানো ভাব্‌তা এলো পুজুরী বামুনের কাচে।

এইসব ভাবতে ভাবতে চোদ্দরাত হেঁটে যখন আকটো ইষ্টিশানে এলাম তকন পুব দিকে আলা জ্বেলে ঠাকুর আসতে নেগেছে। আকটো পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কমলিতো বসে পল্লো। তার কোলে পুঁটুলিটো দিয়ে আমুও বসলাম পাশে। গোটা রাতটো কতা হয় নাই। কি বলবো বুঝতে লারচি। ভাবতে ভাবতে বলে ফ্যাল্লাম, পান খাবে?

কতা বললোনা কমলি। হেঁটোতে মুক গুঁজে রইলো।

আর কিচু বলতে লারলাম। ভাবচি আর ভাবচি। কেবল ভাবচি। গায়ে হাত দিতে গেয়ে দেলামনা। বললাম, কেলাস্ত নাগচে?

তেমু কত্তা নাই। পেছন দিকে তাকিয়ে ছাকলাম দোকান খোলে নাই। বললাম, পান খাব দোকান খুল্লে।

কম্‌লি তেমনিই রইলো। টুক্‌চি বাদে বোজলাম সি কাঁদচে। কি কববো না বুজিই হাতে হাত দেলাম। কিচু বললোনা। তাবে আগ্‌ড়ুং কেঁপে উটলো মনে হলো। বললাম কেঁদনা, আমি খুব ভালবাসি। এই কতা শুনে সি আবও কাঁদতে নাগলো।

পানের দোকানটো খুললো। ছামুতে গেয়ে ডাঁড়ালাম। ছাকলাম বড পারা আয়না। মনে পডলো ছানিকাটা চালায় আমার সেই আয়না ভাঙা কাঁচটোর কতা। কত তপাৎ। কম্‌লিকে টেনে লিয়ে এলাম। আয়নায় ছাকলাম পাশাপাশি ডাঁড়িয়ে। কত সোন্দর এই কম্‌লি। পদ্ম যানো। তাবে সুয্যির আলায় শুকিয়ে যেইচে। আমাকে তার পাশে মান্দের বলিই মানাইচে। ঐ জন্যিই উ কাঁদচে। কত কি বইচে দোকানে। সিগ্‌রেট, বিড়ি, টানাকাটি, কাঁচ ভাঙা নক্ষ, খইনির ডিবে, চুণের ভাঁড় ক টা খালি বোতল, ক্যা আকজনা বিটিছেলে স্যুট পরে হাতে কুকুরের শেকল ধরে রইচে ছাবিতে, মহাদেব আবার বাটিতে করে লীলপারা কি খেচে, পাশিই আকটো রেড়ুয়া, তাবে ছাবি দেকা যায় সি লয়, ··

কি লেবে ?

চুমকিয়ে ওটলাম দোকানদারের কোশ্চেন শুনে। বললাম, পান দাও দুটো, আর সিগ্‌রেট আক প্যাকেট, আর বিড়ি আক বাণ্ডিল, আর আল্‌তা সেঁন্দুর আচে ?

ইমন সময় কম্‌লি নিজে থেকে আমার হাতটো খপ্‌ করে ধরলো। বোজলাম আল্‌তা সেঁন্দুর লেবেনা।

আদিমপুরে আজ ক'দিনই থাকা হয়ে গালো। বড়বাবুর চিট পেয়ে জায়গা দিয়ে আকটো ছিটে বেড়ার ঘর করে দিয়েচে গোপে বামুন। তারই বাড়িতে আমরা দু'জনাতে কাজে

নেগেচি। সবাই জানতে চাইচে আমরা ক্যা!

আকদিন বললাম, কম্‌লি, মাথা ঠারোমো করোনা, সেঁন্দুর পর তা লইলে নোককে কি বলবো?

কম্‌লি বললে, না কিচুতিই লয়।

ক্যানে লয়?

সেঁন্দুর আমাকে আকজনাই পরিয়েচে, আর কেউ লারবে।

কিন্তুক নোককে কি বলবে?

আগ্‌ডুং ভেবে কম্‌লি বললো, বলবো প্যাটের কুটেটোকে জন্ম দিয়ে মিন্‌সে মইচে।

আর যখন শুদুবে আমি তোর ক্যা? তখন?

আবার ভাবলে কম্‌লি। বললে, বলবো উটো আমার ভাই বাবার দুটো বিয়ে ছুলো—

কি বললে, আমি তোমার ভাই! স্যাঁই বুঝি তোমাকে আতো নজ্জা সয়ে লিয়ে এলাম! উসব হবেনা, সেঁন্দুর না পরলে খেদিয়ে দোব—আমি বেটাছেলে যিদিকে চোক যায়—

শ্যাষ পোযন্ত সেঁন্দুর পবলো কম্‌লি, তাবে নিজে হাতে, খুব টুক্‌চিপারা লাল দাগের মতন।

আজ আমার বয়েস হইচে, কম্‌লির আরও পাঁয় বচর বেশি। তেমু কম্‌লিই খাটে, আমি খাটতে লারি। কুঁড়ে বলে আমার দুন্নামও খুব। কেউ মুনিষ ল্যায়না। কম্‌লি খেটে খুটে যা খাবার আকডুং পায়, পাতের মাকাচোকা ভাতও আমাকে এনে দ্যায়। তার বেটাকে দ্যায়না। বেটা উসব খায়না। তার বন্ধু জুটেচে ছবিলাল। সি বেটা বর্গাদার। মুনিষকে ধান দ্যায়না। সব এনে দেয় বংশী মালের বৌত্তর পায়ে, আর বিয়েন বেলা থেকে চাকি ডোবা পোযন্ত ঘুরুর ঘুরুর করে বংশীর বৌত্তর কাচে। বৌটো সোন্দরী ব্যাটে, তাবে কম্‌লির মতন লয়। গেঁড়া শক্ত সমত্ত গড়ন। বংশী কেরু বাড়িতে

কাজে পাটায় না, সম্মান লষ্ট হবে যি! বংশী নিজে মাজে মাজে ছুল্লো খেটে বেড়ায়, আর বৌ গোঁজ হয়ে বসে থাকে, আমুও বাড়িতে থাকি, কিন্তুক আমার সঙ্গে কতা নাই। মাজে স্থাক দিয়ে অ্যালেদা খোঁপ করে দিইচি। তাতিই বসে ছবিলালের সনে হাসি তামাসা করে। আমি দেখতে লারি। বলি, আর ল্যাই লাগে বংশী। বৌটো সোঁতোদিন কুটুর কুটুর করে লাগায় আর বংশী লাটি তোলে। এমনি করিই বংশী আমাকে সিদিন মাল্লে।

বংশীর কতায় রেগে গেয়ে উয়োর মা কি বলতে গালো, আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। আকোন জোর হয়েছে, বৌ হয়েছে, আকোন তো মারবিই।

হ্যাঁ বেশ করবো মারবো, বলে গজর গজর করতে করতে পালিয়ে গালো বংশী।

সিদিন গরুর পাল ঘরে আসবার সময় আমার স্থাহটো খানিক গরম হচ্ছে। মাতাটোও ধরলো আগ্‌ডুং। কিন্তুক কি আর করি। ক্যা দেকবে ক্যাই বা ডাক্তোরকে মরুগ্‌গো আর তো ভাবার কিচুই নাই।

সাঁজ বেলায় কম্‌লি বুজতে পাল্লে সি আমার গা-টো ভাল নাই। উয়োর মনটোতে ছট্‌কটানি ধরে গালো। ইমন সময় বংশী এলো বগলে আকটো রেড়ুয়া লিয়ে, খুব জোর বাজচে ব্যাটে।

ক্যার রেডিও রে, কম্‌লি শুদুলে।

ক্যার আবার হবে—আমার।

তু কোতা পেলি?

ছবিলালকে কি আমি সাদে ভালবাসি? বন্দু বলি?

আকটুকুন ভেবে কম্‌লি বললে, তুয়োর বাবার জ্বর—পিল এনে দে দিকিন?

রেডুয়াব বোতাম ঘুরুইতে ঘুরুইতে বংশী তকন বৌটাকে কি বোঝাইছুলো, বললে, আমি লারবো।

পিতিমীটোকে আঁদার বাক্ষুসীটো তখন গিলে দিয়েচে। কেবল পচিদিকে মোটা তারাটো যানো বলচে—ভয় নাই বুচো মাস, আমি ল্যাগোই ছিষ্টিটোকে বাঁচাবো—আলা দোব।

কম্‌লি ছুটো বড়ি লিয়ে এলো।

আঁদারে গেলি কি করে? শুদুলাম।

কেরু ওপর রেগে গেলে আমার চোক জ্বলে, যি। এই লাও আকটো আকোন খাও—সব কমে যাবে, তা'পর ঐ বাটিতে—ঠাকরুণের বাড়ি থেকে ছু'টো শুকনো রুটি ঐ বুড়োটোর অসুক, কাপড়ে চোপড়ে হয়ে ছুলো, সিগোলা কেচে দিয়ে—উয়োদের আজ অমাবস্যের পালন—ডালও আকড়ুং দিয়েচে।

তুমি খাবেনা কম্‌লি?

ওঃ, আজ বুজি শুদুইতে মন হচে!

বড়ি আকটো খেয়ে যাগ্‌ গা-টো আকড়ুং সুক সুক করতে নাগলো। তা'পর নস্কটো কাছে দিয়ে ছু'টো গোটা রুটি আর আকটোকে ছু খানা করে ছিঁড়ে টিনের থালাতে টুক্‌চি ডাল ঢেলে এগিয়ে দিলে কম্‌লি।

কিন্তু ভাল নাগছুলোনা। লাড়াচাড়া দেকে কম্‌লি বললে আমি খ'য়ে দি লাও। বলে বাঁ হাতটো ঘাড়ে দিয়ে ডান হাত দিয়ে খইতে নাগলো। খানিকটুকুন খেয়ে দম মেরে গেলাম।

কি হলো?

আমার তকন মাকে মনে পাড়চে। চোকের জল বাগ মানছুলোনা। আর উদিকে পাশের খোঁপে জোর রেডুয়া বাজচে, ছবিলালের কতা শোনা যেচে মাজে মাজে। তারই তো আজ দিন।

দিন কতক পরে আবার ভাল করে ঠারো হলাম। পিটের দাগ গোলান তকন মিলিইচে। রেডুয়াটো দেখতে মন হচে,

কিন্তুক ঘেন্না ও খুব। তেমু গাবু বাজিয়ে গান গোলা যকন হতো তকন ভেতরটো নাচতো বৈকি। কেমশো কেমশো ছবিলালের আসা'-য আর কষ্টি নষ্টি করা আতো বেড়ে গালো সি থাকতে পাল্লাম না। বললাম, এই ছবে—ই দিক মাড়াবিনা, বেবে আমার ঘর থেকে।

বংশী বল্লিই পালাবো, ছবিলাল অবাক হয়ে বললে।

বংশী বলুগ্ আর না বলুগ্ তু আর আসবিনা।

ছবিলাল কি ভাবলো ক্যা জানে। বললে, তাবে আমার রেড়ুয়া আমি দোবনা। বলেই বগলে রেড়ুয়া লিয়ে পালিয়ে গালো।

আর যায় কোতা গরুর পাল ঘুরেচে আর আরম্ভ হলো—পেতমে কাজিয়ে, পরে মারামারি।

বংশী বললে ক্যানে তু বন্দুকে উমন কতা বল্লি?

বেশ করেচি, আমার ঘরে উসব চলবে না।

তোর ঘর না তুয়োর বাবার ঘর।

বললাম, তুয়োর বাবার ঘরতো ধ্যাটে।

দোর দেকবি শালা শুয়োরের ছা'কে। উ আবার বাবা হইচে—শালা সাদের বাবা—

ছুটে এলো নোকজন, ছুটে এলো কমলি। কমলি বললে, দিন দিন বাপকে মারবি নাকি?

উ আমার বাবা লয়।

ক্যা তোর বাবা?

তু জানিস।

কমলি চুপ করে গেয়ে আকড়ুং পরে বলতে নাগলো, ঝাড় কি, বংশ কি! ছিঃ ছি ঘিন্না হয়।

তুদিকিই দেকে আমার ঘিন্না হয়।

ইমন সময় বৌটো বেরিয়ে এসে গাল ফুলিয়ে ডাঁড়িয়ে রইলো কমলির দিকে চেয়ে। কমলি সিদিকে চেয়ে বললো, আকোন তো বলবি, কি করে বড় করেচি তা তো জানিস না।

কোন হারামজাদী তোকে মানুষ করতে এয়িস্‌লো! আবার আমাকে উয়োদের ঘিন্নে হয়—আচ্চয্যি আচ্চয্যি। আর তুদিকে আমার বড্ড ভাল লাগেরে। ছবিলাম ক্যানে আসে? তোর বৌয়োর কি দেকে আসে?

সবধানে কতা বলবি মা।

সবধান আবার কি মাইবি নাকি? লে মা'কে মার!

কেউ কেউ তু'জনাকিই থামাইতে গালো—কিন্তুক আমুও আর থাকতে লারলাম, ঐ তু'টোকিই বিষ দিয়ে আকদিন মেরে দে কম্‌লি।

ক্যা কাকে মারে ছ্যাক্ বলে হটাৎ বংশী ছুটে এসে আমার পাঁজরে ইমন আক্‌লাথি মাল্লে যি আমি আকবারে কেটে ল্যা বাঁশের মুড়োতে গেয়ে পল্লাম। মাতাটো কেটে রক্ত পড়ে নাগলো গা গড়িয়ে। পাশাপাশি নোকজন সব হুটোপুটি নাগিয়ে দিলে। চাদ্দিক থেকে আরও মেলাই ছুটে এলো। ছবিলালকে যারা পচন্দ কত্তোনা তারাও এলো আবার ছবের দলের নোকও এলো। আরম্ভ হলো মারামারি। শুদু লাটির ঠুইঠাই শব্দ আর আত্তনাদ। আকটো বাঁক দিয়ে ছবিলাল মাত্তে এলো আমাকে। কিন্তুক কম্‌লি তকোন আমাকে ধরে। তারই পিটে পল্লো বাঁকের বারি। সি তো 'বাবাগো' বলে আমাকে ছাল্লে। ক্যা আকজনা শাবল দিয়ে ছবিলালের মাতাটো ফাটিয়ে না দিলে আমাকে বোধায় সি মেরিই ফেলতো। ওমনি সঙঙে সঙঙে ছুটে এলো বংশী। আমার মাতায় শাবল তুলতিই কম্‌লি চিচ্‌কার করে এগিয়ে দিলে নিজের মাতাটো।

হাসপাতালে দারোগাবাবু আমাকে শুধুইলে, কম্‌লি তোমার ক্যা হতো বুচো?

বেদম কষ্ট তকন আমার। তেমু কুনোরকমে বললাম, ইস্‌তিরি।

তাকে ক্যা খুন করেচে ঠিক ঠাওর কত্তে পেরেচো?

আকড়ুং চুপ করে থেকেও বলতে লারকাম।

কি হলো? কুনো ভয় নাই বলো।

আবার ভাবলাম বলবো কি না।

দারোগাবাবু আবার বললো, কি হলো চিনতে লেরেচো?

আমি মাতাটো তু'পাশে লড়িয়ে দেলাম: চোকের জল গড়িয়ে পল্লো বালিশে।

আকাড়্হা, সামলা গাই, আর মুনের আগুন

সাধন কুমার রক্ষিত

[মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম্য কথ্য ভাষা বেশ শ্রুতিমধুর। 'আকড়হা, সামলাগাই আর মুনের আগুন' গল্পটি উত্তর রাঢের-মূলতঃ কৃষ্ণপুর দিয়াড়া অঞ্চলের লোক ভাষায় রচিত।

গল্পের লেখক সাধন কুমার রক্ষিত লেখালেখির জগতে অল্প বিস্তর পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁর আজন্ম বাস। পেশায় শিক্ষক হলেও রাজনীতি সচেতন এই মানুষটি সত্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী লেখক। বহু সমাজ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি জড়িয়ে আছেন।]

খুলা মাঠে রোদের ঝলাসে গরু ছাগল নিংয়ে টিকতে না পেরে গরু-ছাগল ডাকিং এনে সল্লা পুখোরের পাহাড়ে দিংয়ে লিজে শিবতলার নিম গাছের নামুতে ছিংয়্যায় মাথাল লড়িট্যা থুংয়ে ধপ. কোরে নেড়্হা ঠুকে সুপল হাল সাম্লাতে লাগল। গুনা-গাঁঠা বয়েসও তো তার কম হলো না! পাঁচ ছ'টা আকাড়্হা দেখ্যাছে, দু' দু'ট্যা পেল্লাই লড়াই দেখ্যাছে। কী দেখেনি সে? বসে বসে তারই হিস্যাব কষতে বরোঞ্চি থেকে বিড়ি বাহির কোরে কাঠিতে ধরিংয়ে আন্‌মনে টানতে থাকে। ম্যাল ছুটি পাওয়া গরু-ছাগল লিক্‌লিক্যার মুতুন পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে ব্যাড়ায়।

ঘাস কোতি আছে যে খাবে ? আজ তিন মাস ধরে বিষ্টি নাই। জোষ্টি-আষাঢ় শাউন গড় গড় কোরে চলে গ্যালো ; উপর থেকে এক ফুঁটাও জল টোপালো না। জমিজমার মাটি ফেটে আদেখ্‌ল্যাব মুতুন হা কোরে আছে। গাছের পাতা, ঘাস, গরুম গোলাব ভাপে শুকিংয়ে জড়ো সড়ো, আম্‌সি ! তার শরীলের চামড়াতেও টান ধরাছে, আমচুবের মুতুন হতে লেগ্যাছে। হবে বা না ক্যানে ? বয়েস কি কম হলো ? চার কুড়ি চাব। আজ পোড়্যাছে মার প্যাট থেকে ? বিড়িতে সুখ্‌টান কোষে গরুগুলাব পানে লজর করে সুপল। ছ্যাখে, পুখোরের গাদে নেমে হাঁসা বলদটা ঘবলিক্যা গুলানীব মুতুন খিঁচ্‌ড়ল হাঁবপাঁক কোরে গিল্‌ছে। গরুর মুতুন তারও পিয়াস কম লাগেনি, কিন্তু কি কোরে বাড়ী যাবে ? যদি ব্যাড়্‌হা ভেঙে গরু কুববানের কচুতে ঢুকে ?

—'দাদো, বিড়িট্যা ফেলিয়ো না গো আগুনটো হামাকে ছ্যাও।' বা শুনে পেছু দিকে তাকায় সুপল। তাব ভাবনার গিঁট খসে যায়। ছ্যাখে, ঢাকি নামিংয়ে তাব দিকে হাত বাড়িংয়ে দাঁড়িং আছে মহাসিন। সুত্যা পার হওয়া বিড়িতে শ্যাষ টান মেরে মহাসিনের হাতে তুলে ছ্যায় সুপল।

মহাসিন তাব পাঁজবে বসে বিড়িব প্রুকুটিতে বিড়ি ধরিংয়ে বোলে—'গরুমে মবি গেল্যাম !' এব্যারো তো বোছরের গতিক ভালো ঠেকছে না দাদো !'

সুপলও হাইলিশ্বাস ছেড়ে বোলে—তাই তোবে ভাই ! গতবারের মুতুন এব্যারো তো পোছ্যাঁ হাওয়া ধর্‌যাছে।'

—গত সুনের মুতুন এব্যারো যদি পানি না হয়, তাহিলে কুনু মানুষ কি বাঁচবে ? মুখে পানি উঠি সগ্‌ মরবে !

এব্যারে আকাড়্‌হা হলে বিয়াল্লিশ-তেঁতাল্লিশ সুনের আকড়্‌হাকেও ছাড়িং যাবে ! কারুন তখুন লোকের হাতে রস

ছিল। ত্যাখে ধানের আকাল ছিল না। পাঁচসিক্যায় একমুন ধান। এখুন যদি তোদের সে সব কথা বুলি তাহিলে বুলবি লোকটা পাগল; বুড়হ্যা বয়সে মাথা বিগড়্যালছে! ভেব্যাছিলাম ভাদই উঠ্‌লে দু'চাব মাসেব খুরাকের সুস্যার হবে, কিন্তু তারও আশা নাই।

—ভাদোয়ের কথা আর বুলিয়ো না, জমি সাদা হুং গেল্‌ছে। পানি ব্যাগোডে ফুল্যাতেই পাবলে না বাবোয়েব দড়িব মুতুন শুকিং সব খ্যাড। তাই দেখে শুনে পুয়াতী গাইট্যার লেগে ঐ ত্যাখো এ্যাক ঢাকি ভাদই কেটে আনল্যাম।' বুলে আংওল তুলে লিজের ঢাকির দিকে ত্যাখায় মহাসিন। ককিংয়ে মবে যাওয়া পুষাতী ভাদোয়েরদিকেতাকিংয়ে হাইলিশ্বাস ফ্যালে সুপল। তার ব্যাটা, বো, বিটি, লাতি-লাতনীকে হয়তো এমনি কোরে ককিংয়ে মরতে হবে। গত সুনেব আকাড়্‌হায় না হয় কুনু রকুমে জোড়াতালি দিংয়ে চল্যাছে, কিন্তু এব্যাব? কিসে সতা দিবে? ভাদোই মোবে দড়ি। কাড়হানেবও কুনু লক্ষুণ নাই। ঘোর হুংয়ে কালো ম্যাগ উঠছে, তড়পাছে, তারপর বাতাসের ঠ্যালায় চোটে কুন ত্যাখে যি সে ম্যাগ ছুটে পালাছে তার উদ্দিশ নাই। সেদিন সাধুন মাষ্টার বুলছিল—আম্‌রিকা না কে, হিংস্যা কোরে অদের ত্যাখে ম্যাগ ধরাব কল পেত্যাছে। সব ম্যাগ উখানে যেংয়ে জল ঢালছে! হবে না তা বুলা যায় না। আজক্যাল কলের যুগে আনখাই আনখাই সব জিনিস হোছে!

—তাই যদি হয়, তাহিলে অদের মুখে মুড়হ্যা ঝাঁটা মারতে হয়্যা দাদো!

—এ্যামুন বিশ্বাস ঘ্যাতিক্যার যারা কাজ করছে, তাদের মারতে তো হয়! কিন্তু মারবে কে? তোর আমার ব্যাপার হলে এ্যাদ্দিন কি আর বাকী থাকত?

—দাদো, আল্লা যদি এব্যারো পানি না ছায়, তাহিলে কি কোরবা?

কি আর করব? নেতাদের মাথায় তুলে নাচবো! শালাদের [সাদে কি আর মুখে গাল বেড়্যাছে?] দশ বোছরের রাজত্বে তিন তিন ব্যার আকাড়হা হলো, দু'দু'ব্যার বাণ হলো, তবো কি অদের ক্যার্ আছে? শান্ আছে? মাঠে মাঠে ডিপটি কি ক্যানেল দিয়্যার যদি ব্যাবস্থা করত তাহিলে আজ আমাদের কি আর নাখের জলে চোখের জলে হয়. না হাত গুটিংয়ে বসে থাকি?

—শুনছি বোলে হামাদের খামাকাটার মাঠে ডিপটি হবে নাকি?

—বাপের আমল থেকে শুনছি তো ম্যালা কিছু—আমাদের পুলটা পাকা হবে, গাঁয়ে বিজলি আসবে, মাঠে ডিপটি বোসবে? তা হলো কিছু? ছ্যাঁচা জল আর শুনা কথার কুনু দাম আছে? সব ভাঁওতা, বুজলি! ভোট লিব্যার ফন্দী! ভোটের সুময় মানুষকে ছাঁকা ছাঁকা কথা বুলে মুন ভিজ্যায়। তারপর কাজ হাসিল হলে তখুন কে কার?

—তা যা বুল্যাছ দাদো। হামাদের পাশের গাঁয়ের মেম্বর, চ্যারম্যান, কি পোরোধান মুন্ করলে কি একটো ডিপটি স্যান্স্যান্ করতি পারত না? খুব পারত। কিন্তু সব নিমুখারম অরা ছাখো গা নিজের গাঁয়ে ডিপটি বসালছে বাড়ীর লাছ

পেরিযুক্ত পাকা আস্তা করি লিয়্যাছে, ইলেকটিক আলো লিয়্যাছে! আর হামাদের ব্যালায় কচুপুড়া। এ্যাথুন হামাদের গাঁয়ে কুনু লেতার টুপিও ছাখা যায় ন্যা।

—ভোট আসতে দে, তখুন দেখবি কত জুনার কত জিহ্যাল। বক্তিমা। রাত দিন এসে যেংয়ে তোর বাড়ীর আগ্‌ন্যা কাদা করে দিবে।

অদের ছুচোখ্যামুতে আব ভুলছি ন্যা। এব্যার ভোট চাহিতে এলে হক কথা জানিং দিব। আগু মাঠে ডিপটি বসার ব্যবস্থা করো, আস্তা পাকা করি ছাও, তেবে ভোট পাবা। নাহিলে তুমাদের মুখে.....'

—'থাক থাক, খাবাপ কথা বুলার দবকাব নাই; অরা সব ভদ্দরলোক!' সুপল মহাসিনকে ঠাণ্ডা করে।

—অরা মানুষ, না হয় খারাপ হলো; কিন্তু ভগবান, সেই বা লিদ্দোষী কিসে? আমরা কি এ্যামুন পাপ কোর্য্যাছি যি পর পর ছু সুন আকাড়্‌হা দিছে?

—খাঁটি কথা বুল্যাছো দাদো! উ ব্যাটা ও হারামী! নাহিলে কি হামাদের এই দশা হয়? এ্যাকেবারে বেখুশ। কুনু রহমত নাই। উ যা অন্নায় করছে না, উ যদি খালি হামাদের মুতুন মানুষ হতো, হামরা অর কাছে যেতে পারতাম, তবে কবে অকে হালাল করতাম! জভাই করিও আগ পড়ত না।

—ই কথা মিছ্যা লয়। একটা কিছু অক্তাঅক্তি ব্যাপার হতোই। তা যখুন হবার লয়, তখুন এব্যারের আকড়্‌হায় কি করে বাঁচবি ভেবে দেখ্যাছিস? খেংয়ে না খেংয়ে কত কষ্ট কোরে পিঠে গাধার মুতুন কাপুড়ের গাঁটলি বহে এ্যাদ্দিনে সংসারটাকে একটু গড়িন্যা করল্যাম, আর ভগবান যদি বাদে লাগে, তাহিলে কি করবো বোল্?

—সেই তো দাদো হামরাও তো বাড়ীর ঢোয়্যা-টাকুন,

রাং-পিতোল, গাছ, বাঁশ সগ বিচে-কচে চাষ করার লেগি হালের বলদ কিনল্যাম, আর যদি পানি না হয় তাহিলে বেঘোরে মারা যাব না ?

—'সেই তো রে, শ্যাষ পোযুন্ত ঘুটিং চুষা গাঁ ছেড়ে বাজি-কোরের মুতুন ছ্যাশে ছ্যাশে ডো ডো করে বেড়্যাতে হবে হয়তো !' পছি পাহাড়ের দিকে নজর পড়তেই সুপল হ হ কোরে উঠে। ছ্যাখে, অর সামলা গাইট্যা ব্যাড়হা ভেঙে কুরবানের জমিতে ঢুকে পড়ে মস্‌মস্ কোরে ঘাস. কচু খেতে লেগ্যাছে। প্যাটের জ্বালা বড়ো জ্বালা ! লড়িট্যা হাতে নিংয়ে মাথায় মাথাল গুজিংয়ে সুপল হ হ করে তেড়ে যায়। গাইট্যা ঘেরে এসে বোলে—'বুঝলি মহাসিন কালে কত কী দেখব। নাহিলে গরুর কখুনো কচুর গাছ খাওয়া দেখ্যাছিস ?'

—সাদে কি আর খেছে দাদো, ঠ্যালার চোটে খেছে ! একটু আগে তুমি বুলছিল্যা না, আকাড়হা হলে ছ্যাশ ছেড়ি পালাব ; তুমার গাইয়ের কাণ্ড দেখে হামার মাথায় একটো বুদ্দি এলো—পালাতে হলে সভাই পালাব ; হামরা- গরীবর‍্যা একলাই পালাব ক্যানে ? আরো দশ বারো দিন দেখবো, যদি পানি না হয় তাহিলে সভাই মিলে জোট্ বেঁধি ঐ চ্যাবম্যান, পোরোধানের বাড়ীর কেওয়ার ভেঙি তলায় বাঁধা তিন সুনের ধান নিংয়ে আসব।

—'তাই বুলে অধর্ম করবি ? চুরি-ডাকাতি করবি ?' সামলা গাইয়ের মুতুন হ হ করে মহাসিনকে তেড়ে আসে সুপল।

—'চুরি কোরবো ক্যানে ? বুলে-কোহে দিনের ব্যালায় লিব। উটা তো অদের বাড়তি ধান ; ফাউ। হামাদের পাওনা। এ্যারেত যদি অদের ইমান না থাকে, তাহিলে হামাদেরই বা থাকবে ক্যানে ? ব্যাঙ্কে টাকা আর তলাতে ধান বেঁধি রেখে অরা বো-বিটি নিংয়ে টি-ভি দেখবে কবিতোরের মুতুন ভোকা হুংয়ে খেলে ব্যাড়াবে, আর হামরা মাগছেল্যা নিংয়ে খাওয়া

ব্যাগোরে মুখে পানি উঠি মরব, তা তো হয়না দাদো। তাই মরি মোরব, সগকে নিংয়ে থুংয়ি মরবো।' তহবুনের বরোঞ্চি থেকে ছুট্যা টেপি বিড়ি বাহির কোরে একটা লিজের মুখে নিংয়ে আর একটা সুপল সরকারের দিকে বাড়িংয়ে দিংয় মহাসিন বুলে উঠে 'বিড়ি খাবা তো ল্যাও। আগুন ছাও।'

সুপল কাঠি বাহির কোরে বিড়ি ধরায়। মহাসিনকে ছায়। মহাসিন ঢাকি মাথায় তুলে বিড়ি টানতে টানতে বাড়ীর পথ ধরে। কযে টান মেরে এ্যাক মুখ ধুঁয়্যা উগলিংয়ে সুপল তার চলে যাওয়া ছাখে। ভাবে, মহাসিনের মুনের আগুনে কত জুন ভুখ্যার চ্যারাক জ্বলে উঠবে কে জানে। গন্নি দুপ্পহরে তার সামলা গাইট্যাই সব লণ্ডভণ্ড কোরে দিলে। ধবে যাওয়া মুনের আগুনকে কি দিয়ে লিভ্যাবে সে? আকাডহার পোছ্যা বাতাসও বেশ জোরে বহিছে। তাই বা সে থামাবে কি করে?

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ঝলাস— উত্তপ্ত বাতাস। নামু-নীচে। ছিংয়্যা-ছায়া। মাথোল-মাথার আচ্ছাদন। লড়ি-গরু ডাকা লাঠি। নেড়হ্যা-পাছা। আকড়হা-অনাবৃষ্টি ; খরা। লিক্‌লিক্যা-অভুক্ত। কোতিকোথায়। টোপা-ঝরা। আদেখল্যা-বুবুক্ষু। পুখোর পুকুর। গাদ-কাদা। খিঁচ-ময়লা। রা-কথা। পেছু পিছন। আগু-আগে ঢাকি-বড় ঝুড়ি। পাঁজরে-পাশে। পুকটিতে-পিছনে। বোছর-বছর। সুন-সাল। কুনু-কোন। সগ-সব। রস-টাকা-পয়সা। মুণ-চল্লিশ সের। বিগড়্যালছে-খারাপ হয়েছে। ভাদই-ভাদ্র মাসে ওঠা ধান। খুরাকের খাবারের। সুস্যার সুব্যবস্থা বাবোই-এক প্রকার ঘাস। পুয়াতী-গর্ভবতী। ককিংয়ে-যন্ত্রণায় চিৎকার করে। সতা সাহায্য। কাড়হান-বর্ষায় চাষের উপযোগী বৃষ্টি।

দুগ্ধ বারতা

মনোহর বসাক

[বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা নদীয়া। ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি চর্চায় নদীয়া একটা ঐতিহ্যের ধারক। শান্তিপুর নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। শান্তিপুরের মিষ্টি কথা বাংলা ভাষাসাহিত্যের একটা বড় অলংকার।

সম্প্রতি নদীয়া তার নিজস্ব ভাষা হারাতে বসেছে। সীমান্ত ঘেঁষা জেলা হওয়ার জন্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বহু ভাষাভাষী মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই জেলায়। এখন নদীয়ার আদি ভাষাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। শান্তিপুরের জন মানসেও কলকাতার কথ্য ভাষারই ব্যবহার ঘটছে বেশি করে।

নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কাছাকাছিই ফুলিয়া। মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মভিটে হিসেবে ফুলিয়া ঐতিহাসিকতার দাবী করতে পারে। এই ভিটেতে বর্তমানে যাদের বাস তাদের অধিকাংশই তন্তুজীবি এবং টাঙ্গাইল থেকে আগত। দেশ জোড়া টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ীর যে খ্যাতি তার প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র এই ফুলিয়া। এখানকার তন্তুজীবিদের মুখের ভাষায় রচিত হয়েছে দুগ্ধবারতা গল্পটি।

গল্পের লেখক মনোহর বসাক একজন দক্ষ তাঁতশিল্পী। তাঁর হাতে তৈরী শাড়ী কতজনের যে প্রিয় উপহার হয়ে কত জনের ঘরে গেছে তার সংখ্যা নেই।

মনোহর বসাকের শিল্পী সত্তাশুধু তাঁতের শাড়ী তৈরীতেই কাজ করেনা অবসর করে নিয়ে তিনি গল্প কবিতা লেখেন। ইতিমধ্যে কলকাতার একটি সাময়িক পত্রিকায় তাঁর লেখা একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। মনোহর সাহিত্যের নীরব সাধক।]

বাবু মাইন্‌সে গো পোলাপানের মক্কর বোঝা দায়। মহাজনের ছাওয়ালডার কতা কি আর কমু। হের যত কুয়ারা খাওয়নের সোমায়। সোনা-তোলা কইরা গাও মাথা হাপ্টাইয়া, ভাত মাইখ্যা মুখে তুইলা দিলে তুই গরাস খায়। তাও কি মুখ খুইলবার চায়? বাবা না, সোনা না কইয়া কত যে আদরই করন নাগে! দুধের বাটি দেইখলে তো ছুইট্যা পলায়। ধইরা বাইন্ধা দুধ গিলানো - তুই এক ফোঁটা প্যাটে যায় কি না-যায় বেশি-ফুটিই ফালানী যায়। মায় আইস্যা যেদিন ধরে, কিলাইয়া আধমরা কইরা পোলারে দুধ খাওয়ায়। কিন্তু পলানী পারে না। ওমুন দৈত্যি পোলার নগে দস্যিপানার জোর পলানীর গায়ে নাই।

খায় না তাও আয়োজনের কামাই নাই। আপেল বেদানা ফল ফলারি বিস্কুট হরলিক্স কত কি! আর দুধ দেড় কিলো রোজ। বেবাকই ওই পোলার নিগা। বাপে তো খাইবার সোমায়ই পায় না। বিহান বেলায় ওঠে উট্টু বেলা কইরা। উইট্যা হাত মুখ ধুইয়া খায় এক কাপ চা, নগে একখান বিস্কুট। বাস! হেই যে চইল্‌লো হের ব্যাপসার কাম—তাঁতি পত্র সুতানাতা কাপড়-চোপড় ট্যাহা পয়সা ইসাব কিতাব। বেলা তিনডার আগে হের খাওনের উপায় নাই।

তিনডার সোমায় তো খায়, হেরে কি খাওয়া কয়? ভাজাভাজি ডাল তরকারী মাছের ঝোল কত কিচু। কিন্তু হেই একমুঠ ভাত, ইয়ার বেশি বাবুর গলা দিয়া নামে না।

আর মা-ঠাইকিন—ওই মহাজন-গিন্নী. হের অম্বলের ব্যারাম বাবো মাইস্যা। যা খায় তাই প্যাটে যাইয়া আগুনের শীষের নাগাল ওঠে বুক বাইয়া গলা বাইয়া। তাই হে পরায় কিচুই খায় না। কিবা কইরা যে বাঁইচা রইচে—খালি গুটি খানেক ওষুধ খায়, ট্যাবলেট খায়। রাইত দিন ক্যাট্ ক্যাট্ করে বেবাকের নগে।

পলানীর পরাণডা দুঃখে ফাৎ ফাৎ করে। হেরও একটা পোলা আচে ঘরে আর আচে একটা বসের ম্যায়া। তাগো কপালে ছয় নয় মাসে একফোঁটা দুধ জোটে না। আর এখেনে অঢেল জিনিস হরি গঙ্গা অয় যত খায় তার তেগুণা ফালায়।

ফালাইলে ওইবো কি, পলানী যে নিজের পোলাডাব নিগা ম্যায়াডার নিগা কিচু যে সরাইবো হে উপায় নাই। উই-যে গিন্নী-ঠাইকিন, অম্বলের ব্যারাম নিয়া পইড়া থাকে—হোগুনের চোখ তার—ঠিক ধইরা ফালায়।

অন্য পাড়ায় পলানীর বাড়ি। দুই বছর ওইলো সোয়ামী মরচে। এই মহাজনের কাচেই কাম কইরতো—তাঁতের কাম। কামাইদারী ব্যাটাছেলে মইরা গেল—কোলের পোলা আর ব'সের ম্যায়াডারে নইয়া কিবা কইরা বাঁচে পলানী? মহাজনের পায়ে আইস্যা পইড়্যা গেল হেষমেষ। হরেনরে মহাজন ভাল চোখে কোনদিন দেখে নাই, হে নাকি মহাজনের কতার বাধরে চইলতো। কিন্তু হেই হরেনের বিধবা বউয়ের উপুর, কিন্নিগা। জানি দয়া ওইলো, মহাজনে কইল, থাকো আমাগো বাড়ি, কামের লোকতো দরকারই। তুমি থাকো, খাও, কামকাজ কর, মাস গেলে দুই চার ট্যাহা মায়নাও নিও। কিন্তু তুমার পোলাপানের ঝামেলা বাপু এ বাড়িতে চইলবো না, হে কতা আগেই কইয়া দিলাম।

গিন্নী-ঠাইকিনও তহন ঝংকার দিয়া উঠচিলো, হ বাপু রক্ষা কইরো! আমার একটা নিয়াই বলে পরাণ আয় যায় করে।

তুমার গুলান আবার আইস্থা যুদি জ্বালান আরম্ভ করে তাইলে আর বাঁচুম না।

পলানী কতামতো কোন ঝামেলা আনে নাই। নিজের পোলারে কোল থিকা নামাইয়া থুইয়া আই স্থা মহাজনের পোলারে কোলে তুইল্যা নিচিলো হে-দিন। তহন থিকাই পলানী এবাড়িতে। নিত্তিদিন হেই ফুটা বিহানে উইঠ্যা আহে। হাবাদিন জবর খাট্‌নি খাটে—দিন শেষ ওইলে বাইতের কাম গোছাইয়া থুইয়া তারপরে বাড়ি যায়। ম্যায়াভা ব'সের—বান্নাবাড়া হেই করে, ভাইডারে রাখে।

পলানী কোন কোন সোমায় বইস্থা বইস্থা ভাবে, ভগমানের চোখ নাই, বিচার নাই। যারা খাইবার চায় না, যাগো প্যাটে সয় না, তাগোরে হে ভাণ্ডো উপুর কইরা ঢাইল্যা দেয় ফালাইয়া ছাড়াইয়াও তাগো ফুরাত না। আর যাগো প্যাটে জায়গা অনেক ক্ষিদা অনেক তাগোরে বেলায় ফুক্কা।

পলানীর ম্যায়াডা খাইবার পাবে—। কিন্তু ভালো মন্দ পাইবো কনে? পোলাডা ইট্টুখানি দুধের নিগা কত যে কান্দে। কিন্তু পলানী জোটাইবো কহান থিকা?

হ, হেষ মেষ দুধ জুইটলো পলানীর কপালে, ভগমান মুখ তুইলা চাইল। কিন্তু হায়গো, পলানী কি এই চাইচিলো?

একদিন গিন্নী ঠাইকিনের ব্যারাম খুব বাইড্যা গেল।

নিয়া খাওন ওইলো হেরে কইলকাতায়। কর্তা গেল নগে। পোলাডারে থুইয়া গেল, আর হেরে আগলাইবার নিগা উইড়া আইস্থা জুইড়া বইল কর্তার এক পিসি। মোটা ভুরুস্ চেহারা, আর কি তার চোটপাট! হারাদিন বাড়ি মাথায় কইরা নাচে। হুকুম লাইগাই আচে, পলানী এডা কর, ওডা ধর। কইরা কইরা পলানী আর কুল পায় না

গিন্নী ঠাইকিন নাই, পলানীর একটা সুযুগ ওইচিলো। আশা আচিলো, এই সুযুগে দুইডা একটা দষ্য বাড়িতে সরানো যাইবো, এডা ওডা নিয়া পোলারে ম্যাগ্নারে দিবো অরা দুইদিন ইট্টু সুখে খাইবো।

পোলাডার কয়দিন ধইরা জ্বর। ইট্টু দুধ নিয়া দিলে হে যে কি খুশি ওইবো।

কিন্তু ওম্মা, পিসির পিট্‌পিটা চোখে ধুলা দিবার যো নাই। পলানীর চেষ্টা কইরা পারে নাই, হেষের দিন হাতে মুঠে ধরাই পইড়ল দুধের ঘটি ছদ্দা।

চারদিন পরে কর্তা বাড়ি আইলো। আর কোন কতা নাই, পিসি মাগী হগলের আগে পলানীর দুধ চুরির কতাডাই তার কানে তুইলা দিল।

রুগীর অবস্থা খারাপ, তাই কর্তার মন মেজাজও খারাপ। তার উপর পলানীর অপকর্মের কতা শুইনা কি জানি কোন রূপ ধরে।

পলানী ডরের ঠ্যালায় এক্কেরে আধামরা ওইয়া থাইকলো। কর্তায় আগে পোলারে দিয়া পিসিয়ে পাঠাইল কইলকাতায়। নগে আরো একগুচ্ছের আত্মস্বজন গেল গিন্নী-ঠইকিনরে দেইখতে।

সদর গেটে তালা দিয়া আইস্যা, কর্তায় শুইয়া পইড়লো বিচানায়। বড় ধকল গেছে কয়দিন শরীলে। পলানীরে ডাইকা কইলো, কেউ জানি হেরে বিরক্ত না-করে।

পলানী ডরাইয়া ডরাইয়া হগল কাম করে, কহন যানি ডাক দেয়? ডাইকা হৈচ করে বেবাক।

রান্ধাবাড়ি কইরা পলানী কর্তার ঘরের কুয়ারের কাচে খাড়াইয়া আস্তে কইরা ডাক দেয়, কর্তা জাগেন নি?

হ, জাগি। কর্তা কোঁহাইয়া কয়, ঘুম আইতেচে নারে।

—চান কইরা খাইয়া দাইয়া শোন যাইয়া, ঘুম আইপোনি। কইয়া পলানী যাইবার নয়। কর্তা ডাকে, পলানী শোন। গলা ফ্যাস ফ্যাসা শোনাইল কর্তার, কেমুন জানি অন্যরকম।

পলানী চুপ কইরা খাড়াইয়া থাকে।

কর্তা আবার কয়, পলানী শোন, ঘরে আয়।

পলানী ঘাড় গুঁইজা ঘরে ঢোকে, ডরে পাও কাঁপে হের।

কর্তা ডাক দেয়, কাচে আয়, ডরের কি আচে?

পলানী ঘাইমতে থাকে।

কর্তা খুব দরদ দেখাইয়া কয়, তর পোলার অসুখ?

পলানী কয়, হ।

—দুধ খাইবার চায়?

পলানী ঘাড় নাড়ে।

—তা এ্যাদ্দিন আমারে কস্ নাই ক্যা?

পলানী নিচ্চুপ।

—হ, বুঝি বেবাক। অনেক কতাই মোনে আচে, মুখ ফুইট্যা কইবার যো নাই। জোয়ান সোয়ামী যায় মরে হের মোনের কতা শুনবার মানুষ কহানে।

কর্তার কথার সুর বইদল্যা গেল, চেহারা বইদল্যা গেল। হে উইঠা যাইয়া ঘরের কুয়ার আটকাইয়া দিয়া কিরা খাড়াইল। কি ভীষণ মুর্তি।

—কাইল থনে তর পোলার দুধের ব্যবস্থা আমিই কইরা দিমু। তুই ভাবিস না।

পলানীর কানে হে-কতা গেল কিনা—হে তখন কুল কুল কইয়া ঘাইমতেচে। উপরে কোল ইলেক্‌টারির পাখাডা ঘুইরাই চইলচে সাঁই সাঁই কইরা।

গোয়ালা এহন পলানীর বাড়ি দুধ দেয়। আধেস্তের কইরা রোজ।

'সাহিত্য সৈকত' পত্রিকার পাঁচ বছরের রচনাপঞ্জী

বর্ষ ১ সংখ্যা ১ — বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪

অক্টোবর ১৯৮১ — সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

□ কবিতা

অপ্রকাশিত কবিতা	:	নবেন্দ্রনাথ মিত্র	ব১ সং১
নদীয়া	:	প্রেমেন্দ্র মিত্র	,, ,,
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম	:	কালী কিঙ্কর সেনগুপ্ত	,, ,,
সময়ের দীর্ঘরাত্রি	:	কৃষ্ণ ধর	,, ,,
সনেট	:	সুজিৎ কুমার রায়	,, ,,
শতবর্ষে বিধানচন্দ্র স্মরণে	:	রতন কুমার বসাক	,, ,,
দেরী করে ফেরা	:	ঈশানচন্দ্র মিশ্র	,, ,,
কালের প্রহরী	:	দীপক হোতা	,, ,,
চিন্তা	:	হরপ্রসাদ মিত্র	ব১ সং২
একগুচ্ছ কবিতা	:	কাকলি ভট্টাচার্য	ব১ সং৩/৪
আরোগ্য নিকেতন	:	শচীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	ব৩ সং১
বাধ্যতা	:	হরপ্রসাদ মিত্র	,, ,,
নক্ষত্রের আরশি	:	কল্যাণ দে	,, ,,
প্রিয়নামে ডাকতে ইচ্ছে হয়	:	সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী	ব৩ সং১
সৈকত থেকে সাহিত্য সৈকত	:	ঈশান চন্দ্র মিশ্র	ব৩ সং২
মাতৃত্ব	:	শিবানী চক্রবর্তী	ব৩ সং২
পঁচিশে বৈশাখ	:	কাকলি ভট্টাচার্য	ব৩ সং৩
বাইশে শ্রাবণ	:	কাকলি ভট্টাচার্য	,, ,,
দার্জিলিং-এর পথে	:	কাকলি ভট্টাচার্য	ব৪ সং৪
অরণ্যে উল্লাসে	:	শিশির গুহ	,, ,,
বস্তুতঃ যেটুকু ভেদ	:	শশিভূষণ মিত্র	,, ,,
জঙ্গলের দিনরাত	:	ঈশান চন্দ্র মিশ্র	,, ,,

□ গল্প

ধন্বন্তরি	:	প্রভাত কুমার গোস্বামী	ব১ সং১
সুশান্তর কনে দেখা	:	মাধব ভট্টাচার্য	,, ,,
আশ্রয়	:	কাকলি ভট্টাচার্য	,, ,,
রজনীগন্ধা	:	তৃপ্তি মিত্র	ব১ সং২
ক্ষণিকের স্মৃতি	:	রতন কুমার দাস	,, ,,
সংস্কার (মেদিনীপুর জেলার লোকভাষায় রচিত গল্প)	:	কাকলি ভট্টাচার্য	,, ,,
মধুমতী (বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোট গল্প)	:	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ব২ সং১
পুলিশ বনাম বিবেক	:	গৌর পাল	,, ,,
প্রতীক্ষা	:	কাকলি ভট্টাচার্য	,, ,,
ভোটের জয় পরাজয় এবং	:	অবয়ব	ব৩ সং১
গুরবারির সংসার(মেদিনীপুর জেলার লোক ভাষায় রচিত)	:	কাকলি ভট্টাচার্য	ব৪ সং৩
ঘর	:	তপন ভট্টাচার্য	,, ,,
রাঙা মেয়ে মীনা	:	মাধব ভট্টাচার্য	,, ,,
মধুমতী (পুনর্মুদ্রণ)	:	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ব৪ সং৪
বড়লোক	:	গৌর বৈরাগী	,, ,,

□ প্রবন্ধ/ফিচার

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বিষয়ে	:	হরপ্রসাদ মিত্র	ব১ সং১
ছোবিতা	:	ধীরানন্দ রায়	ব১ সং২
বাংলার মন্দিরে রামায়ণ কাহিনী	:	তারাপদ সাঁতরা	,, ,,
ছোবিতা (পুনর্মুদ্রণ)	:	ধীরানন্দ রায়	ব২ সং১

জীবনের দুঃখ কষ্ট	:	প্রভাত কুমার গোস্বামী	ব২ সং১
নন্দলাল বসুর অপ্রকাশিত ছবি ও চিঠি	:	অনিল কর্মকারের সৌজন্যে	ব২ সং২
কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী	:	সুখময় মুখোপাধ্যায়	,, ,,
Phuliawasita dream ?	:	S. K. Dey	,, ,,
ফুলিয়া শহরের বুনিয়াদটা অনেক শক্ত করে লাগান হয়েছিল	:	এস. কে. দে	,, ,,
জীবনে যদি সবচেয়ে শক্ত কোন প্রফেশন থাকে সেটা হলো শিক্ষকতা	:	বামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, ,,
শিক্ষার ক্ষেত্রে ফুলিয়ার অচল মন্থরতা	:	গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী	,, ,,
মূলকথা হচ্ছে এটা কার বেবী জনমানসের সৃষ্টি সামর্থে	:	সমরতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, ,,
আমি প্রচণ্ড আস্থাশীল	:	সন্তোষ কুমার ধর	,, ,,
ফুলিয়া উপনগরী পরিক্রমা	:	দেব প্রসুন ঘটক	,, ,,
ফুলিয়া উপনগরী	:	মোহিত ভট্টাচার্য	,, ,,
ফুলিয়ার আদিবাসী	:	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	,, ,,
ফুলিয়ার তাঁত শিল্পে সমবায়ের ভূমিকা	:	হরিপদ বসাক	,, ,,
ফুলিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটি কথা	:	মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস	,, ,,
ফুলিয়া উপনগরীর পুনর্বাসন	:	মনীন্দ্রনাথ মজুমদার	,, ,,
ফুলিয়ার শিল্প ও শিল্প শিক্ষালয়	:	শিশির কুমার সিংহ	,, ,,
আমার শিল্প জীবনের তীর্থক্ষেত্র	:	পাঁচু গোপাল দত্ত	,, ,,
ফুলিয়া কলোনীর সাংস্কৃতিক জীবনের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা	:	দিলীপকুমার দাশগুপ্ত	,, ,,
ফুলিয়া উপনগরীর ইতিকথা	:	চারুচন্দ্র জোয়ারদার	,, ,,
উপেক্ষিতা উপনগরী-ফুলিয়া	:	সুনীল চন্দ্র দাস	,, ,,

ফুলিয়া উপনগরীর সমাজ	:	গণেশ রায়	ব২ সং২
একটি শিশুর আঁকা ছবি	:		,,
ফুলিয়ার মাটিতে কৃত্তিবাসের উত্তর কাল	:	মাধব ভট্টাচার্য	,,
এক নজরে সাম্প্রতিক ফুলিয়া	:	মাঃভঃ	,, ,,
মানুষকে নিজের মধ্যে মাঝে মাঝে মগ্ন হতে হয়	:	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ব৩ সং১
রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার রোমাঞ্চ আমার মনে নেই	:	সরিৎ মজুমদার	,, ,,
বন্দেআলী মিয়ার কবিতা	:	মাধব ভট্টাচার্য	,, ,,
সাংস্কৃতি ও শাসক শ্রেণী	:	প্রভাত কুমার গোস্বামী	,, ,,
মিলন শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনী	:	কাকলি ভট্টাচার্য	,, ,,
সৈকত সম্পর্কে	:	হরপ্রসাদ মিত্র	ব৩ সং২
সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি	:	প্রভাতকুমার গোস্বামী	,, ,,
আমরা বাঁচবো কি মরবো ?	:	পান্নালাল দাশগুপ্ত	,, ,,
ফুলিয়া উপনগরীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা	:	দেবপ্রসূন ঘটক	,, ,,
বারো বছর ধরে যুদ্ধ	:	মাধব ভট্টাচার্য	,, ,,
রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ব৩ সং৩
রবীন্দ্রনাথের বংশ পরিচয়	:	মাধব ভট্টাচার্য	,, ,,
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা	:	ঈশানচন্দ্র মিশ্র	,, ,,
রবীন্দ্রনাথেরগানেবিস্ময়ানুভূতি:		মমতা মিশ্র	,, ,,
স্বপ্ন এবং সত্য	:	এস, কে, দে	ব৩ সং৪
মিলন স্মরণ সভা: নবীনচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ	:	মাধব ভট্টাচার্য	,, ,,
পশ্চিম বাংলায় রামলীলা		তারাপদ সাঁতরা	,, ,,

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সাক্ষরতা	:	দেব প্রসুন ঘটক	বর্ষ সংখ্যা
শিশু সাহিত্য	:	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	বর্ষ ৪ সংখ্যা ১
আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাটা আরম্ভ হওয়া দরকার	:	সুকুমার সেন	,, ,,
শিশুকে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সেবা	:	স্বামী রমানন্দ	,, ,,
শিশুর ক্ষেত্রে শিক্ষা দিতে হবে অনুভূতি নিয়ে	:	স্বামী নিত্যানন্দ	,, ,,
ভারতে শিশু শিক্ষা	:	গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী	,, ,,
অঙ্গনওয়ারী প্রোজেক্ট	:	পান্নালাল দাশগুপ্ত	,, ,,
শৈশবের চিত্রময় বই	:	গোলোকেন্দু ঘোষ	,, ,,
রাশিয়ায় শিশু শিক্ষা	:	প্রভাত কুমার গোস্বামী	,, ,,
শিশু কি হবে শিশুর ভেতরেই তা' আছে	:	রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, ,,
শিশু শিক্ষার কথামালা	:	ধীরানন্দ রায়	,, ,,
শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের চোখে শিশু শিক্ষা	:	জ্যোতির্ময় বসু	,, ,,
শিশুকে গ্রহণ করতে হবে সংবেদন শীল মন নিয়ে	:	কুপরঞ্জন গোস্বামী	,, ,,
শিশুর মধ্যে কৌতূহল জাগানো দরকার	:	ফাদার এ ওয়েভিল	,, ,,
রামায়ণের অবাক কাণ্ড	:	অন্নদা মুন্সী	বর্ষ ৪ সংখ্যা ২
রামায়ণ সমস্যা	:	উপেন্দ্রনাথ সেনশাস্ত্রী	,, ,,
প্রাচীন সাহিত্য প্রসঙ্গে	:	গোলোকেন্দু ঘোষ	,, ,,
বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস	:	অজিত কুমার ঘোষ	,, ,,
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশপঞ্জী	:	রতন কুমার দাস	বর্ষ ৪ সংখ্যা ৩
সে যুগ আর এ যুগ	:	গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী	,, ,,
ধর্মের পলিটিক্স	:	ধীরানন্দ রায়	,, ,,
কাঁথি অঞ্চলের লোকভাষা	:	লোকনাথ ষড়ঙ্গী	,, ,,

নিলোখেরি, কুলিয়া ও			
এস, কে. দে	:	মাধব ভট্টাচার্য	ব৪. সং৩
রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত চিঠি	:		ব৫ সং১/২
কৃত্তিবাস পণ্ডিত	:	দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	,,
বাংলারমন্দিরেরামায়ণ কাহিনী	:	তাবাপদ সাঁতরা	,, ,,
(পুন মুর্দ্রণ			
বৃক্ষতলে মন্ত্র ঝরে	:	মাধব ভট্টাচার্য	,, ,,
যবন হরিদাস	:	কাকলি ভট্টাচার্য	,, ,,
নদীয়া জেলার প্রাচীন কবি	:	মাধব ভট্টাচার্য	ব৫ সং৩
(প্রথমাংশ)			
রবীন্দ্রগীতি আলেখ্য ঋতুবদল	:	কাকলি ভট্টাচার্য	,, ,,
দিদির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ	:	প্রশান্ত শর্মা	,, ,,
নদীয়া জেলার প্রাচীন কবি	:	মাধব ভট্টাচার্য	ব৫ সং৪
(দ্বিতীয়াংশ)			
বিপ্লবীবীরনির্যাতিত দেশসেবক			
রাসবিহারীব সহকর্মী শ্রীঅনুকুল			
চন্দ্র চক্রবর্তী	:	অজিত কুমার মৌলিক	,, ,,

অলংকরণ

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়/রাজ সুশান্ত মিত্র/কাকলি ভট্টাচার্য/মাধব ভট্টাচার্য/বিতান ভট্টাচার্য

সংকলক : প্রশান্ত শর্মা

এখন পাওয়া যাচ্ছে—
৫০০ পৃষ্ঠারও বেশি
৫ বছরের **'সাহিত্য সৈকত'**
একত্রে হাফ রেক্সিন বাঁধাই
বই আকারে।
মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

টাঙ্গাইল শাড়ীর প্রস্তুতকারক কি শুধু আমরাই।- না। এই ফুলিয়াতেই আরো কত ভাল ভাল শিল্পী রয়েছেন। তবু, আমরা ভিড় সামলাতে পারিনা।

আসলে যাঁরা একবার আমাদের পরিচয় জেনে গেছেন তাঁরা বারবার আসবেন। আমাদের শাড়ীর ডিজাইন, বুনন, রঙ, ফিনিশিং এ সবের প্রশংসা আমরা করিনা, করেন আমাদের রুচিশীল কাষ্টমাররা। এই ক'দিন আগে ভারতের একজন বিখ্যাত সরোদ বাদক এসেছিলেন আমাদের স্টলে। গাড়ী ভর্তি করে নিয়ে গেলেন আমাদের তৈরী রেশম টাঙ্গাইল।

পুজো উপলক্ষে রেশম আর সুতি মিলিয়ে সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের অনেক শাড়ী তৈরী করেছি আমরা। সপরিবারে আপনাদের নিমন্ত্রণ রইলো।

ধীরেন বীরেন বসাক এণ্ড কোং

ফুলিয়া চটকাতলা, বয়ড়া, নদীয়া

দূরভাষ-ফুলিয়া-৩২

SAHITYA-SAIKAT (Oct-Dec'86) Rs. 4.00
Regd. No. 42112/81 (R. N. I.)
Postal Regd. WB/NDA/(S)/73

এখন ও পাবেন
পুজোর আগের দিন পর্যন্ত
শতকরা ২০ টাকা ছাড় !

এই ছাড়ের পুরো লাভটাই আপনার। সুযোগ নিন যত শীগগির সম্ভব। ফেলে আসা বছরগুলোতে আমরা দেখেছি পুজো অবধি আমাদের স্টক থাকে না। এবারও শেষ অবধি কি দাঁড়াবে বলতে পারছিনা। আমাদের শিল্পী ভাইদের তো রাতের ঘুম গেছে অনেকদিন। প্রতিদিন নতুন নতুন ডিজাইনের শাড়ী আসছে 'শো' রুমে। তবু বলবো দেরী না করে তাড়াতাড়িই চলে আসুন। আজই আসুন। শাড়ীর এ্যালবাম দেখার সুযোগ একমাত্র এখানেই।

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড।

টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড।

বৈঁচা বসাকপাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া।

দূরভাষ : ফুলিয়া—২২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য □ প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরনী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

সাহিত্য সংকলন

□ বর্ষ ৬ □ সংখ্যা ২ □ জানু-মার্চ ১৯৮৭

এ সংখ্যার সূচী

কবিতায় কৃত্তিবাস শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বনফুল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র,
কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, গোলোকেন্দু ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রামায়ণ

কবি করুণানিধানের একটি অপ্রকাশিত চিঠি,
দুটো কবিতা ও ভাষণ

কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব : কিছু ভাবনা কিছু উদ্যোগ
কিছু ভালবাসা

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ চিত্র।

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলী (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১।	প্রকাশ স্থান	:	সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া। পিন ৭৪১৪০২
২।	প্রকাশকাল	:	ত্রৈমাসিক
৩।	প্রকাশক ও মুদ্রাকর	:	শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া। পিন ৭৪১৪০২
৪।	নাগরিক	:	ভারতীয়
৫।	সম্পাদক	:	শ্রীমাধব ভট্টাচার্য (অবৈতনিক) সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া। পিন ৭৪১৪০২
৬।	নাগরিক	:	ভারতীয়
৭।	স্বত্বাধিকারী	:	শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া। পিন ৭৪১৪০২
৮।	মুদ্রণ	:	মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া ২৪ পরগণা।

আমি শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্য।

তারিখ
১/২/৮৭

স্বাঃ—কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশক

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় কৃষি-ঋণের এক বিরাট অংশ অনাদায়ী রয়েছে। তার ফলে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এবছর যে সব জেলায় ও অঞ্চলে বন্যার দরুন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি সেখানে ভালো ফসল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাঁরা সমবায় থেকে কৃষি কাজের জন্য আগে ঋণ নিয়েছেন তাঁদের কাছে পূর্বের কৃষি-ঋণ পরিশোধ করার আবেদন রাখছি। নতুন করে কৃষি ঋণ নিয়ে এঁরা আবার চাষবাসের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করুন।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে সমবায়ের ঋণ মকুব হয় না এবং একজন ঋণ শোধ না করলে তাঁর প্রতিবেশীজনেরা চাষবাসের জন্য সমবায়ের ঋণ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

ঋণ আদায়ের কাজে পঞ্চায়েত, কৃষক সংগঠন, সমবায় সমিতি স্থানীয় বিধায়ক সকলকেই এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

১লা জানুয়ারী, ১৯৮৭ — জ্যোতি বসু

J & C A/N/19/86-87.

* বই কিনুন ।। বই পড়ুন ।। বই পড়ান *

নদীয়া বইমেলা ১৯৮৭

৭-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

স্থান ঃ কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠ

।। প্রতিদিন বেলা ১২-৩০ থেকে রাত ৮-৩০ পর্যন্ত ।।

□ উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঃ ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ বেলা চারটায়। মেলায় ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত যথাক্রমে কমপক্ষে দশ ও পনের ভাগ শতকরা ছাড়ে বই কিনতে পাবা যাবে।

।। প্রবেশমূল্য মাত্র পঁচিশ পয়সা ।।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আলোচনা চক্র, কবি সম্মেলন, সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতি হবে।

সর্বসাধারনের সহযোগিতায় বইমেলা হোক নদীয়াব মানসিক সজীবতার পরিচায়ক।

কার্যালয় ঃ নদীয়া বইমেলা কমিটি ১৯৮৭

প্রযত্নে ঃ জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক, নদীয়া

হাইস্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

[জেলা তথ্য আধিকারিক কর্তৃক প্রকাশিত]

ক্রমিক সংখ্যা আই. এ ও সি. এ/ন =২১/৮ ৬-৮৭

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ থেকে

বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমবায় সমিতি ও ব্যক্তিগত শিল্পদ্যোগে নিম্নলিখিত শিল্পগুলিতে আর্থিক কারিগরী সাহায্য দেওয়া হয়।

১। সুতি খাদি
২। রেশম ও পশম খাদি
৩। কাষ্ঠ ও লৌহ
৪। বেত ও বাঁশ
৫। আঁশ (দড়ি জাতীয়)
৬। মৃৎশিল্প
৭। দিয়াশলাই তৈয়ারী
৮। গ্রামীণ তৈল
৯। চূর্ণ তৈয়ারী
১০। গুড় ও খান্দেসরী
১১। ধান্যকুটাই
১২। ফল হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত ও ফল সংরক্ষণ
১৩। হস্তনির্মিত কাগজ
১৪। চর্মশিল্প
১৫। অভক্ষ্য তৈল ও সাবান তৈয়ারী
১৬। তালগুড় ও তালগুড থেকে প্রস্তুত সামগ্রী
১৭। মৌমাছি পালন
১৮। সার তৈয়ারী ও ব্যবহার এবং মিথেন গ্যাস (গোবর গ্যাস)

☐ উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্যে নিম্নলিখিত অফিসে যোগাযোগ করুন :

ক) বিভিন্ন জেলায়—জেলা শিল্প কেন্দ্রের—জেনারেল ম্যানেজার/খাদি ও গ্রামীণ শিল্প ম্যানেজার

খ) শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক,
প্রযত্নে - পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কার্যালয়

গ) পর্ষদের প্রধান কার্যালয়
২নং মুজফ্‌ফর আহমদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

ঘ) বিভিন্ন জেলায়, জেলা আধিকারিক, পঃ বঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

ইতিহাসখ্যাত ঐতিহ্যমণ্ডিত জেলা-
নদীয়া দর্শন করুন

কৃষ্ণনগর—মৃৎশিল্প ও মিষ্টান্ন শিল্প শুধু রসনাতৃপ্তিকরই নয়, আজও আকর্ষনীয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজধানী, প্রাচীন জনপদ। এখানে আছে অতীত ও বর্তমানের অনুপম দর্শনীয় অনেক কিছু।

নবদ্বীপ—শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি, সংস্কৃতিচর্চার বাগীশ্বরী সাধনপীঠ, বাংলার অক্সফোর্ড।

শান্তিপুর—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের জন্মস্থান, অসামান্য বয়নশিল্প আর রাসমেলা।

ফুলিয়া—বাংলা রামায়ণকার আদিকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান।

উলা বীরনগর—পোড়ামাটির ভাস্কর্য মণ্ডিত মন্দিরের নানা রীতি।

বল্লালচিপি—প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে বৌদ্ধ বিহার স্তূপ আবিষ্কৃত।

পলাশী—স্বাধীনতার সূর্য গমনস্থল।

কল্যাণী—আধুনিক শিল্পনগরী ও কাছাকাছি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়।

শিবনিবাস—পূর্বভারতের সর্ববৃহৎ কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ এবং সতীসহ রামচন্দ্রের অনুপম স্মৃতি দর্শনীয়।

* শীতের আমেজে সকলের নদীয়া হোক পরম রমনীয় *

আই এণ্ড সি এ· ন/২· ৮৬-৮৭

[নদীয়া জেলা তথ্যাধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।]

সোনার বাজারে সত্যি সত্যি আগুন লেগেছে এবারে। সাধারণের মাথায় হাত। আমরাও চিন্তিত। এক একটা দিন যাচ্ছে সোনার দর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এতে কার না ভাবনা হবে। এমাসটা যে আবার বিয়ের মাস। কনের বাবাকে তো ভাবনা মাথায় বসে থাকলে চলবেনা। ব্যবস্থা একটা নিতেই হবে। বিয়েতে 'পণ' এর কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম, আশীর্বাদীত চাই। সোনা ছাড়া বিয়ে হয়! বাঙালীর ঘরে কোনো শুভ কাজই যে বিনা সোনায় হয়না। এই দুর্দিনের বাজারে আমরা আছি আপনার পাশে। *এ. টি. জুয়েলার্স*কে আপনারা আপনাদের অসময়ের বন্ধু ভাবতে পারেন।

কম সোনায় আধুনিক ডিজাইনের গয়না তৈরীর এ অঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান—

এ, টি, জুয়েলার্স

কুলিয়া রেলবাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া

[*মাছ বাজারের সন্নিকট*]

প্রোঃ শৈলেন কুমার কর্মকার

[বিঃ দ্রঃ—আমাদের দোকান বুধবার পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে]

শান্তিপুর কো-অপারেটিভ কোলড্ ষ্টোরেজ সোসাইটী লিঃ

পোঃ—বেলেমাঠ, ফুলিয়া, জিলা—নদীয়া।

ফোন—ফুলিয়া-৪০

৩৪ নং জাতীয় সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত ও পরিবহণের সুবিধাযুক্ত এই সমবায় হিমঘর ৭ম বর্ষে আলু সংরক্ষণ করতে চলেছে আপনার উৎপাদিত আলু কুইন্টাল প্রতি ২৬'০০ (ছাব্বিশ) টাকা ভাড়ায় সংরক্ষণ করুন। এই হিমঘরের অংশীদারগণ ও সমবায় সমিতিগুলির ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি এক টাকা বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে অবিলম্বে কুইন্টাল প্রতি দুই টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় স্থান সংগ্রহ করুন। এ বৎসর সুষ্ঠুভাবে আলু গুদামজাত ও সরবরাহ করার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। চাষীদের সুবিধার্থে IFFCO. সার বিক্রয় করা হয়।

এস, পি, ব্রহ্মচারী
সভাপতি

রমা প্রসাদ সেন
এক্সিকিউটিভ অফিসার

সংসদের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত ৩০·০০
বৈষ্ণব পদাবলী ৭৫·০০
ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ৩৭·৫০
তন্ত্রের কথা ১০·০০
উপনিষদের কথা ১০·০০
উপনিষদের দর্শন ২০·০০
সংস্কৃত নাটকের গল্প ১০·০০
তে হি নো দিবসাঃ ৪০·০০
ঠাকুরবাড়ীর কথা ২৫·০০
The Challenge to India 45·00
Swami Vivekananda and Indian Nationalism 45·00
India Wrests Freedom 70·00
Keats : From Theory to Poetry 30 00

★ বিশদ তালিকার জন্য লিখুন ★

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩৫·৭৬৬৯

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা! কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর; কবিপতি,
নয়ন রঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি!
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি করুণানিধানের একটি অপ্রকাশিত চিঠি, দু'টো কবিতা ও ভাষণের অংশ বিশেষ

ওঁ

নিচিৎপুর কলিয়ারী
বাঁশজোড়া-পোঃ
জেলা-মানভূম
২৫শে মাঘ ১৩৪৭

কল্যাণীয়েষু—

প্রভাস, শ্রীমান্ বসন্ত ইন্দু ও আমি কৃত্তিবাস উৎসবে যাইতে অপারগ হইলাম। কারণ আমার শরীর এখনও অসুস্থ।

এখান হইতেই মহাকবির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা এই উৎসব জয়যুক্ত হউক্।

তোমাদেরই
করুণানিধান

উল্লিখিত চিঠিটি কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। চিঠিটি লিখেছিলেন শান্তিপুর নিবাসী প্রভাস চন্দ্র রায়কে। প্রভাষ রায় তদানীন্তন কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব কমিটির সম্পাদক ছিলেন। বছর দুই আগে তিনি মারা গেছেন। চিঠিটি রক্ষিত আছে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদে।

মানভূম থেকে বাংলা ১৩৪৭ সালের ২৫শে মাঘ কবি যে

চিঠি লিখেছিলেন তাতে কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবে আসতে অক্ষম এ কথাই জানিয়েছিলেন। পরে অবিশ্যি তিনি এসেছিলেন। স্মরণোৎসবের যা নথিপত্র পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৩৪৭ সালে কবি করুণানিধান কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবে এসেছিলেন এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। সভাপতি হিসেবে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষ এবং কবির লেখা দু'টো কবিতা এখানে দেওয়া হল। ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—

'রামায়ণের চরিত্র সমূহই আমাদের আদর্শ এবং কবি কৃত্তিবাসই বাঙ্গলা রামায়ণ রচনা করিয়া রামায়ণী কথাকে মুদির দোকান হইতে রাজ অন্তপুর পর্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচারের সুযোগ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। লোকের স্মৃতির কষ্টিপাথরেই কবিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। মহাকবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ গাথা আজও সকলের মুখে মুখে শোনা যায়। কাজেই উহার জনপ্রিয়তা ও কবির শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রতিপন্ন হয়। তিনি কাব্যলক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার রচিত চির নবীন রামায়ণ গাথা আজও আমাদের আনন্দ বর্ধন করিতেছে। রামায়ণী শিক্ষার মহোচ্চ আদর্শে তিনি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। মহাঘোষ শঙ্খে রামলীলা বিঘোষিত করিয়াছেন। বঙ্গের সারস্বত কুঞ্জে তাঁহার মহাবীণ চিরদিন ঝঙ্কিত থাকিবে।'

বিভিন্ন সময়ে লেখা কবির কবিতা দু'টোর পূর্ণমুদ্রন করা হল এখানে—

কৃত্তিবাস-গৌরব

উড়ে উড়ে পড়ে আজি ফুলঘরে পুরাণো স্বপন-ধূলি,
বসি হেথা কবি পুসক অমৃতে ভরিয়া নিয়েছে তুলি।
'সানার বাঙলা আলো করে' আছে তোমার সোনার লেখা ;
মহাকাব্যের খণ্ড-আকাশে তুমি জ্যোতিষ্ক একা।

রামধনুভাঙ্গা রঙের গুঁড়ায় গৌড় হৃদয়াকাশ-
বিচিত্র করি' গিয়াছ হে গুণী, হে কবি কৃত্তিবাস।
বসি' তমসার সাধন-আসনে গাঁথি পারিজাতহার;
অর্ঘ্য দিয়াছ দেশ-জননীরে ঝরিছে অমিয়াধার।

রঘুকুলমণি রামচন্দ্রের জয় লক্ষ্মীর বরে
তুলিছে বাণীর মণির দেউল ফুলিয়ার ফুলঘরে।
কোথায় এমন প্রাণ-গলা রস, ননীর ত্রিবেণী ভরা!
এমন মধুরী সুধার লহরী সরসিয়া যায় ধরা!

কল্প-তরুর রসালগুচ্ছ বাঙলার বাগিচায়,
ফলায়েছ কবি ভাবুক বাঙ্গালী আগলি' রেখেছে তায়।
পূর্ণ হেরেছ যে রস-পশরা সোনার সুপ্রভাতে,
তারি আনন্দ-চন্দন-লেখা ভাষার পদ্মপাতে।

যুগ-উজ্জ্বল তব প্রতিভার দিব্য অরুণোদয়ে,
গর্বিত মোরা এই অক্ষয় গৌরব-সমারোহে।
চির-পূর্ণিমা-তীর্থ-যাত্রী, হে যশো-রথের রথী,
পেয়েছ কীর্ত্তি-রতন কিরীট কালের জলধি মথি'।
জীবন-ইন্দ্রজালের মদিরা মাতায় না আর মন,—
শান্তি-প্রয়োগে পেয়েছ বন্ধু, মিলেছে পরমধন!
লহ অঞ্জলি বন্দনা-শ্লোক, ওগো নমস্য বুধ,
পৌঁছে সেথা কি পূজার মন্ত্র, শব্দেরি বুদ্‌বুদ্?
আজিকে তোমার পুণ্য 'ভিটা'র নির্ম্মল-করা ধূলি
প্রসাদ-ভিখারী এ দীন ভক্ত মাথায় লইল তুলি'।

কৃত্তিবাস-প্রশস্তি

জয় কবি কৃত্তিবাস, রাম নামামৃত রসধারে
অভিষেক করিয়াছ বর্ণময়ী বাগ্‌দেবতারে;

আনন্দের গন্ধরাজ নিবেদিয়া পদপ্রান্তে তাঁর
পেলে অমরত্ব বর এইখানে, এই ফুলিয়ার
গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত তোমার সাধন-স্বপ্ন-বেদী,
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ ধ্বজা তার ওড়ে অভ্র ভেদি'।
তোরণ গড়েছ তুমি রামধনু চিত্রার্পিত করি
সারস্বত-কুঞ্জদ্বারে উলটিয়া আলোর গাগরী।

কীর্ত্তি তব শ্লোকমালা, রামায়ণী মঞ্জু-আলিপনা
ক্ষীয়মাণা নহে কভু, অফুরন্ত রস-উদ্দীপনা।
যে মালঞ্চে প্রবেশিয়া পূজাপুষ্প করিতে চয়ন
মধুর উদয় সেথা মধুব্রতে করে আমন্ত্রণ,
ডাকে নীলকণ্ঠ পাখী, জাতিস্মর ভোলেনি তোমায়
একেলা লাগে না ভাল, কবি-সঙ্গ যাচে পুনরায়।
তোমার গানের লীলা নানা রাগিণীর মূর্ত্তি ধ'রে
ঝঙ্কারিত বাঙালীর প্রাণে-প্রাণে, অন্তরে অন্তরে।

অনবদ্য দান তব, উপার্জ্জিলে বিপুল সম্মান,
শাশ্বত যশের জ্যোতিঃ যুগ-যুগান্তরে দীপ্যমান।
ত্রেতার বল্মীকে-সিদ্ধ বাল্মীকির আশীর্ব্বাদ লভি
তব যজ্ঞ-অগ্নিজাত দিব্য এক পুরুষ গৌরবী—
প্রাপ্য ভাগ পেলে তুমি অমৃতের চরু-পাত্রে তাঁর,
শান্তবুদ্ধি হে ব্রাহ্মণ, তোমারে করি গো নমস্কার।
অপ্রতিম রামরূপ দেখেছ তৃতীয়-নেত্র ভরে'
পরন্তপ রামগীত শুনিয়াছ সুপ্তি প্রজাগরে।

মহাঘোষ শঙ্খ তব, রন্ধ্রে তার গর্জ্জিছে সাগর,
বেঁধেছ ছন্দের ডোরে সেতুবন্ধে ভৈরব সমর।
মহাবীরে অনুসরি রাবণের গুপ্ত-মৃত্যু-বাণ
সন্ধান করেছ কবি, ত্রাসে যার পৃথ্বী কম্পমান।
রাম অবতীর্ণ হ'লে খসে যায় শিরস্ত্রাণ হতে
মুক্তা-ফল অশ্রুরূপে গলে রক্ষো-নারী-নেত্র-পথে।

দণ্ড দিয়ে স্পর্দ্ধিতের ডিণ্ডিম বাজিল স্বর্ণ তটে,
দেবতারা উৎকণ্ঠিত বিরাট সে আকাশের পটে।

বৈরী-রক্ত-অলক্তকে শোভিল সে কন্যা-কুমারিকা—
নিভে গেল, সিন্ধুকূলে লঙ্কেশের অভিমান-শিখা।
রটে ডঙ্কা রামেশ্বরে, সাড়া দেয় সমস্ত ভারত,
উদ্ধারিয়া হৃতা সীতা অযোধ্যায় ফিরে রামরথ।
তারপরে কি দুর্দ্দৈব, প্রজাপুঞ্জে কবিতে রঞ্জন
অগ্নি-পরীক্ষায় শুদ্ধা সেই রাম-রমা-নির্ব্বাসন ;
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু যার লাগি সে রাজ-লক্ষ্মীর
বিলাপ-লহরী-সুরে কাঁপে আত্মা তমসা নদীর।
নাহি সেই রঘুবংশ, নামশেষ রামরাজধানী,
হিরণ্য পরিধি যার, নিশ্চিহ্ন সে সিংহাসনখানি।

অক্ষৌহিণী সেনা যার উড়াইতে চাহিত পর্ব্বত,
অভিযানে বাধা দিতে অক্ষম ইন্দ্রের ঐরাবত।
সে অস্ত-সূর্যের স্তব মুখরে সরযূ-কলস্বরে,
শুনেছিলে হে দরদী বেজেছিল সে দুঃখ অন্তরে,
সহেছিলে মহাকবি, অরুন্তুদ গভীর বেদনা,
আবেশের উন্মাদনা—কাব্য তব তাহারি ব্যঞ্জনা,
যুক্ত অনন্তের সাথে—শুনিয়াছ পরিপূর্ণ গান,
মহীয়ান্ করে যাহা চিরন্তন মানুষের প্রাণ।

উঠিয়াছে উর্দ্ধগ্রামে তব কবি-মানস-সপ্তক,
যশঃ-ক্ষয়-কৃৎ কাল দেয় ভালে অজেয় তিলক।
ফুলিয়ার পুণ্য-তীর্থে তোমারে দেখিতে দিবাকর,
চিনিত প্রভাতী তারা ; পেলে মন্ত্র-কল্যাণ-সুন্দর

কোথা সে জীবন-পর্ব্ব, বেদবিৎ কুল-পুরোহিত ?
টুটেছে বটের মূল পুরাতন মন্দিরের ভিত;
পূজাহারা দেবতারা, হোমগন্ধ না বহে পবন,
ছদ্মবেশী আত্মঘাত মায়ামৃগে মুগ্ধ করে মন।—

জাহ্নবী সরিয়া গেছে, স্বল্প বারি ধূসর বৈসকতে
বঞ্চিত হইয়া আছে নবীন জীবন ধারা হতে;
মূর্চ্ছিত শৈবাল-গুল্মে ভাসাইয়া কবে গো আবার,
পৌর্ণমাসী-চন্দ্রোদয়ে শূন্য ঘাটে জাগিবে জোয়ার,
যেথা থেকে এসেছিলে, ফিরে গেছ সে নন্দন বনে।
মিলিয়াছ অকলঙ্ক বাণী বর পুত্রদের সনে।।
সম্রাটের উপহারা বিলাইয়া অকিঞ্চন জ্ঞানে
বনফুল হার গলে, বসে যোরা সারদার ধ্যানে।

আঁধারের ছায়া নাহি যে অক্ষয় প্রদীপের তলে
তারি শিখা হতে তুমি দীপ জ্বালি দিলে কুতূহলে
লহ করি পূজা-অর্ঘ্য, অবসেছ যে উৎসব-সভায়
নেপথ্য-রহস্য-লোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পঁহুছে সেথায়।

—প্রশান্ত পার্থ

চিঠি প্রভাস রায়ের পুত্র মৃণাল রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত একটি কবিতা : পূর্ণমুদ্রণ : শতনরী কাব্য গ্রন্থ থেকে।

মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মদিনে

কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি সর্ব্বব্যাপী
তিনি রাজার প্রাসাদে আছেন
আছেন গরীবের কুটিরেও।
যোগী তপস্বীদের অন্তরে
পাপী-তাপীদের হৃদয়ে
সর্ব্বত্র তাঁর মহিমান্বিত আসন।

মহাকবি বাল্মীকির
বাঙালী ভাষ্যকারই শুধু নন তিনি,
তিনি রামের কাহিনীকে
নিজের প্রতিভায়
বাঙালী সজ্জায় সাজিয়েছেন।

অমর কবি তিনি
তাঁর কাছে সবাই আমরা ঋণী।
তাঁর জন্মদিনে
একটি লোক দেখানো প্রণাম জানিয়ে
সে ঋণ শোধ হবে কি?
মন বারবার এই প্রশ্নই করছে।

বনফুল

কৃত্তিবাস

পাঁচ শত বর্ষ ধরে
বাংলার ঘরে ঘরে
ছড়িয়ে দিয়েছ তুমি
রাম সীতা লক্ষ্মণের কথা
প্রেমের ত্যাগের সেই অপূর্ব বারতা
সঞ্চার করেছ প্রাণে
শ্রদ্ধা ভক্তি মহত্বে বিশ্বাস
কবি কৃত্তিবাস।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কবি কৃত্তিবাস

বাংলার বাল্মীকি তুমি, কবি কৃত্তিবাস
'কীর্তির্যস্য স জীবতি' তাই তব বাস
নিজ কীর্তি পরিচয়ে। অগ্রদূত তুমি
বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তব জন্মভূমি
পবিত্র ফুলিয়া গ্রামে। পিতা বনমালী
জননী মেনকা নামে। নূতন পাঁচালী
রামায়ণ বিরচিয়া লভিলে সম্মান
গৌড়েশ্বর সভাস্থলে। তব শ্রেষ্ঠ দান
ভারতের সত্যাদর্শ, রামচন্দ্র কথা;
মহাবীর হনুমান, সীতা পতিব্রতা,
লক্ষ্মণের ত্যাগশৌর্য – আর রাম নাম
সাষ্টাঙ্গে তোমারে তাই জানাই প্রণাম।
রামচরিতের কবি শ্রীতুলসীদাস
হেথায় স্বনামধন্য কবি কৃত্তিবাস॥

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কৃত্তিবাস স্মরণে

কতো কবিচন্দ্র আছে, কতো চন্দ্রাবতী,
কসমে কোমল তব সীতা, সীতাপতি।
কী জানি দণ্ডকারণ্যে, কতো তরুলতা
সত্যি তুমি দেখেছিলে কিংবা দেখোনি তা।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে শুধু তারিখ বাজিয়ে
অহরহ কী বিচিত্র প্রবন্ধে-নিবন্ধে
নিজেদের যশোলিপ্সা-বশে ঢক্কাতলে
তোমাকে ডোবান বটে গভীর অতলে॥

প্রথম ছাপার যুগে ছিল বটতলা,
তারপরে পাদ্রীদের সেই কৃত্তিবাস।
জয় গোপালেরা এসে মেজে গেল ভাষা,
রসিক যতই কমে, বাড়ে কর্মনাশা।
অধুনা কোথায় তুমি? আছে তব নাম।
ফুলিয়াতে সেই নামে আমারও প্রণাম।

হরপ্রসাদ মিত্র

মহাকবি কৃত্তিবাস

মানুষেরে দেবতা অথবা দেবতারে
মানুষ করি রচিলে অপূর্ব গাথা
ঋষি বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণ।
সত্যনিষ্ঠা, আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা,
প্রজানুরঞ্জন, বীরত্বের নিদর্শন
নারীত্বের মহিমায় ভাস্বর সে গাথা।
কিন্তু হায় সে গাথা ছিল দেবভাষার
নিগড়ে আবদ্ধ। যথা গঙ্গোত্রী উৎস
হতে মুক্ত জাহ্নবী স্রোতস্বিনী
কূলে কূলে জনপদবাসীজনে
বিতরয়ে বারি সঞ্চারে প্রাণ;
তেমতি হে মহাকবি কৃত্তিবাস
দেবভাষার নিগড় ভাঙি মাতৃভাষায়
বিরচিয়া রামায়ণ বিতরিলে আনন্দধারা
গৌড়বাসীজনে নিরবধি। সে সুধা
মহাকাব্য রহিবে অমর যাবৎ মনুষ্য।
প্রণমি তোমায় হে মহাকবি কৃত্তিবাস
দেদীপ্যমান তুমি নক্ষত্রপুঞ্জ মধ্যে যথা সূর্য

গোলোকেন্দু ঘোষ

রামায়ণ

রামায়ণ-মহাভারতকে, মনে হয়, যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।

বস্তুতঃ ব্যাস-বাল্মীকি তো কাহারও নাম ছিলনা। ও তো একটা উদ্দেশে নামকরণ মাত্র। এত বড়ো বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ, আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ-জোড়া দুইটি কাব্য, তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে—কবি আপন কাব্যে এতই অন্তর্ধান পড়িয়া গেছে।

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে তেমনি ইলিয়ড [ও অডিসী] ছিল। তাহা সমস্ত গ্রীসের হৃৎপদ্মসম্ভব ও হৃৎপদ্মবাসী ছিল। কবি হোমর আপন দেশ কালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন। সেই বাক্য উৎসের মতো স্ব স্ব দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে।

আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিলটনের প্যারাডাইস লস্‌ট্‌' এর ভাষায় গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাকনা কেন, তথাপি তাহা দেশের ধন নহে, তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।

অতএব গুটি কয়েক মাত্র প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় ফেলিয়া এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যাইতে পারে? ইঁহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন, ইঁহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে।

প্রাচীন আর্য সভ্যতার এক ধারা য়ুরোপে এবং একধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে এবং ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সংগীতকে রক্ষা করিয়াছে।

আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিনা গ্রীস তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কিনা, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।

এই জন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে; মুদির দোকান হইতে রাজার প্রসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবি যুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহুকোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজ ও অজস্র ধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি মৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে।

এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চির কালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান

এই কারণে রামায়ণ মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র

উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

রামায়ণে ভারতবর্ষ কী বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্ আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।

বীররস প্রধান কাব্যকেই এপিক বলে, এইরূপ সাধারণের ধারণা। তাহার কারণ, যে দেশে যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পাইয়াছে সে দেশে সেকালে স্বভাবতই এপিক বীররস প্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও যুদ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথাপি রামায়ণে যে রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বীররস নহে। তাহাতে বাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই, যুদ্ধ ঘটনাই তাহার মুখ্যবর্ণনার বিষয় নহে।

দেবতার অবতার লীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন পণ্ডিতেরা ইহার প্রমাণ করিবেন। এই ভূমিকায় পাণ্ডিত্যের অবকাশ নাই। এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে, কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেব চরিত্র বর্ণনা করিতেন তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত। সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।

আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং' —কোন একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নারদ কহিলেন—

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈরযুতম্
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ।

'এতগুণযুক্ত পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যে দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।'

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজ গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শ চরিত বর্ণনা ভারতের পাঠক মণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছেন।

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে দেশজয়, শত্রুবিনাশ দুই প্রবল বিরোধীপক্ষের প্রচণ্ড আঘাত, সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণতঃ মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয়না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য-আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান ছিল, এই কাব্যে তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না ; গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রম ধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী-মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া, তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্র গৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ন করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন, এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে।

যথাযথের সীমা কোন্‌খানে এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্য-কলা অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে, এককথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারেনা। বিদেশী যে সমালোচক বলিয়াছেন যে 'রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে' তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।

যেখানে যে আদর্শ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়া গেলে সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহ্যই হয়না। আমাদের শ্রুতিযন্ত্রে আমরা যত সংখ্যক শব্দ তরঙ্গের

আঘাত উপলব্ধি করিতে পারি তাহার সীমা আছে, সেই সীমার উপরের সপ্তকে সুর চড়াইলে আমাদের কর্ণ তাহাকে গ্রহণই করেনা। কাব্যে চরিত্র এবং ভাব-উদ্ভাবন সম্বন্ধে সে কথা খাটে।

এ যদি সত্য হয় তবে একথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া গেছে যে রামায়ণ কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। এই রামায়ণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।

রাম যে একইকালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, রামায়ণ যে একইকালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে, ইহা কখনোই সম্ভব হইত না যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত—যদি তাহা আমাদের সংসার সীমার মধ্যেও ধরা না দিত।

এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমালোচক তাঁহাদের কাব্য বিচারের আদর্শ অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন, তবে তাঁহাদের দেশের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।

রামায়ণ, এবং মহাভারতকেও, আমি বিশেষত এইভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।

* দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী-কথার' ভূমিকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রামায়ণ' শিরোনামে যে প্রবন্ধটি ১৩১০ সনের ৫ই পৌষ লিখেছিলেন তারই অংশ বিশেষ। পঃ বঃ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে উদ্ধৃত।

কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব ঃ কিছু ভাবনা কিছু উদ্যোগ কিছু ভালবাসা

গঙ্গার পার ঘেঁষে বনফুলের চর। আলো-আঁধারি সবুজ পাতায় ছায়া বিছানো শান্ত গ্রাম। ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে রং বাহারী ফুলের মেলা।—গ্রামের নাম ফুল্লবটী। এই ফুল্লবটী গ্রামে এক সময় এক কবি জন্মেছিলেন। সময়টা ঠিক বলতে পারবনা কেউই জানেন না।

ফুল্লবটীতে এখন আর ফুল ফুটেনা। ঐ নাম ধরে কেউ আর ডাকেও না তাকে। নরসিংহের সেই ফুল্লবটী এখন আর নেই, গ্রামের আদল পাল্টেছে, পাল্টেছে নামও। ফুল্লবটী এখন ফুলিয়া। কবি নেই ফুল নেই, সবুজ-শ্যামলিমা নেই। গঙ্গার পার ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বহু দূর সরে গেছে। স্রোতস্বিনী আজ শীর্ণকায়া। এই গ্রামেই জন্মেছিলেন কৃত্তিবাস। —কবি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস নরসিংহ ওঝার প্রপৌত্র, বনমালীর পুত্র।

কৃত্তিবাসের জন্মদিনটা আবিষ্কৃত হলেও ('আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস') অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষ রবিবার, সরস্বতী পুজোর দিন, জন্ম সাল নিয়ে বিতর্ক থেকেই গেছে। পণ্ডিত গবেষকগণ একে অপরের সঙ্গে একমত হতে পারছেননা। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের মতে কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু জাহ্নবী চক্রবর্ত্তী বা আরো অনেকেই ডঃ মজুমদারের সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে কৃত্তিবাসের জন্ম পঞ্চদশ শতকেই, তবে প্রথম দিকে। জাহ্নবী চক্রবর্তী মনে করেন— চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস সমকালীন কবি। আবার ডঃ সুকুমার সেন মত পোষণ করেন—কৃত্তিবাস সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় নিয়ে পণ্ডিত গবেষকদের গবেষণার যেমন অন্ত নেই তর্কযুদ্ধেরও অবসান নেই। কৃত্তিবাসের জন্ম আজ থেকে পাঁচশ কি ছ'শ বছর আগে এ তর্কের মীমাংসা হবার নয়। ও প্রসঙ্গ থাক্। স্মরণোৎসব সম্পর্কে বলি।

সাধারণত মাঘ মাসের শেষ রোববারটিকে ধরে ফুলিয়ায় কবির জন্ম ভিটেতে কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার্থে স্মরণোৎসব হয়। এই স্মরণোৎসবের সূচনাটা কবে? এ ও আর এক গবেষণারই সামিল। হিসেব পত্তর যতটুকু যা পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যায়—বর্তমান বছরটি কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবের ৭১ বছর। বাংলা ১৩২২ সালে প্রথম এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল ফুলিয়ায়। অবিশ্যি এই সূচনাপর্বেরও একটা অতীত আছে। তারও একটা ইতিহাস আছে।

সে ইতিহাস খুঁজতে গেলে একটু পেঁছুতে হবে ইংরেজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ। নবীনচন্দ্র সেন তখন রাণাঘাটের মহকুমা শাসক. কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষা ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ বোধ করি নবীনচন্দ্র সেনেরই। কবির ভিটেমাটি খুঁজে বের করে তা সরকারীভাবে দখল করার কাজটি তিনিই করেছিলেন। তারপর অবিশ্যি তিনি বদলী হয়ে যান, স্মৃতিরক্ষার কাজেও ভাটা পড়ে। এর প্রায় ২২ বছর বাদে ১৩২১ সালে স্মৃতিরক্ষার জন্যে বড় রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কবির জন্মভিটেতে বটের ছায়ায় একটি পাথরের স্মৃতিফলক স্থাপিত হয় ঐ বছর। স্মৃতিফলকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নেমতন্ন জানানো হয়েছিল। শারীরিক অক্ষমতা হেতু রবীন্দ্রনাথ আসতে পারেন নি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন এবং স্মৃতিফলকটির উদ্বোধন তিনিই করেছিলেন। হাজার হাজার

লোক সমাগম হয়েছিল সেদিন। সেইসব দিনে কবির ভিটেতে মেলা বসত কৃত্তিবাস মেলা।

এখনও বসে। তবে তার আকৃতি আর মেলার মত নেই। প্রৌঢ় বয়সী একটি বটগাছ আছে তার ছায়ায় সামিয়ানা টানিয়ে সভা বসে মেলা এখন স্মরণ সভা। কৃত্তিবাস মেলার সঙ্গে হাল আমলের মানুষদের খুব একটা পরিচয় নেই। ৪০/৫০ বছর আগে, যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার চেয়ে আরো খারাপ ছিল কিন্তু তখন যত লোক সমাগম হত এখন হয়না।

কলকাতা থেকে ফুলিয়া অবধি সবাসরি কোন রেলগাড়ী ছিলনা তখন। রাণাঘাটে নেমে খেয়ায় চূর্ণী নদী পেরিয়ে ওপারে ফের গাড়ীতে উঠতে হতো। রেল কোম্পানী বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করতেন। মেলার দিনের জন্যে আর্দ্ধেক ভাড়ায় আসা-যাওয়া করা যেতো। শুধু তাইনা যাত্রীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে রেল কোম্পানী স্টেশন বিহীন ফাঁকা মাঠের মাঝখানে (ফুলিয়া-শান্তিপুর স্টেশনের মাঝে কৃত্তিবাস ভিটের কাছাকাছি) ট্রেন দাঁড় করাতেন।

এখন আর সেরকম হয়না। মাঝপথে গাড়ী এসে আর দাঁড়ায় না। তত বড উদ্যোগও নেই। মানুষেরও ভেতরেও তাগাদা কমে এসেছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী পেরিয়ে বাংলার জনমানসে কৃত্তিবাস যে বেঁচে আছেন তা তাঁর স্ব মহিমায়। সভা সমিতি কৃত্তিবাসকে বড় করেনি, প্রতিষ্ঠা দেয়নি। কোনদিন তা হবারও নয় তথাপি স্মরণ সভা বসে।

হাল আমলে কৃত্তিবাসের এই স্মরণোৎসবে একজন মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি। মানুষটি প্রভাস রায়। দীর্ঘদিন ধরে আন্তরিকতার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি স্মরণোৎসবের হাল ধরে ছিলেন। কৃত্তিবাস ছিল যেন তাঁর প্রাণ। প্রভাস রায় আজ আর বেঁচে নেই, বছর দুই হল তিনি মারা গেছেন।

ইদানীং কালে আর একজনকে দেখি, তিনি সুকুমার

দত্ত। সুকুমার পণ্ডিত নন, গবেষক নন। কৃত্তিবাস সম্পর্কে তিনি হয়তো বিশেষ কিছু জ্ঞানগর্ভকথা বলতেও পারবেন না কিন্তু কৃত্তিবাসকে তিনি ভালবাসেন শ্রদ্ধা করেন তাঁর জন্যে কিছু করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নাওয়া নেই খাওয়া নেই দুপুর রোদে তাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে দেখেছি কৃত্তিবাস অনুষ্ঠানের কথা প্রচার করতে। সুকুমারের মত কৃত্তিবাসকে ভালবাসার লোক কমে গেছে আজকের দিনে।

কৃত্তিবাস ভিটেমাটির ওপর সরকারী উদ্যোগে ১৯৬৪ সালে একটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারিক কেশবলাল চক্রবর্তী বেশ উদ্যোগী মানুষ। তাঁর প্রচেষ্টায় সংগ্রহশালার রামায়ণ সংগ্রহটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাণাঘাটের বর্তমান মহকুমা শাসক কান্তপ্রসাদ সিনহা পদাধিকার বলে কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব কমিটির সভাপতি। সাহিত্যপ্রাণ এই যুবা মানুষটির উদ্যোগও প্রসংশনীয়। শ্রীসিনহা কৃত্তিবাসের জীবন ও কর্মকে ঘিরে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

এই ক'দিন আগে স্থানীয় একজন ব্যবসায়ী, সন্তোষ কুমার চৌধুরী কৃত্তিবাস ভিটেতে ঢোকার মুখে ক্রংক্রিটের একটি তোরণ নির্মাণ করে দিয়েছেন। গত ১৫/১/৮৭ মন্ত্রী বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাস স্মৃতি তোরণটির উদ্বোধন করে গেছেন।

বছর দুই আগে এক বৃদ্ধাকে দেখেছিলাম নাতির হাত ধরে কৃত্তিবাস ভিটেতে এসে শান বাঁধানো বটগাছের নীচে বসে ঝুলি থেকে একটি জীর্ণ ছেঁড়া রামায়ণ গ্রন্থ বের করে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন। নাতিকে বলছেন—'প্রণাম কর। এইখানে বসেই কৃত্তিবাস রামায়ণ লিখেছিলেন।'

এই অশীতিপর বৃদ্ধা বা সন্তোষ কুমার বা সুকুমার কেউই রামায়ণের বোদ্ধা নন। এঁরা কৃত্তিবাসকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় তুলেন না। সভা মঞ্চেও এঁদের স্থান হয়না কৃত্তিবাসকে নিয়ে এঁরা বুলি আউরান না এঁরা শুধু ভালবাসতেই জানেন। কৃত্তিবাসের জন্যে ভালবাসার আসন পাতা এঁদের প্রশস্ত বুকে।

মাধব ভট্টাচার্য।

টাঙ্গাইল শাড়ী অনেকেই বোনে। এই ফুলিয়াতেই প্রায় ১০ হাজার তাঁতি পরিবার আছেন। সমুদ্রগড়েও আছে বেশ কিছু। কিন্তু সব শিল্পীর দক্ষতা কি আর সমান! সমান যে নয় তা সবাই জানেন। বাজারে একটা প্রচার আছে—আমাদের তাঁতশালে তৈরী শাড়ীর দাম বেশি। প্রচারটা মিথ্যে নয়। আমরাও মানি। কিন্তু যাঁরাই আমাদের তৈরী শাড়ীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন একবার, তাঁরা ফিরে ফিরে আমাদের কাছেই আসেন। তাঁরা এটা বুঝে গেছেন পয়সা দু'টো বেশি লাগলেও এখানে পাওয়া যায় কোয়ালিটি প্রডাক্ট।

হ্যাঁ, আমরা কোয়ালিটির কথাই ভাবি। জমিন, রঙ, ডিজাইন সব মিলিয়েই তো একটা শাড়ী। তার ওপর আছে শিল্পীর রুচিবোধ ও নিপুনতা। ক্রেতার রুচি ও চাহিদার প্রতিও রয়েছে আমাদের সজাগ দৃষ্টি।

শীতের মরশুম—বিয়ের মরশুম। নতুন নতুন ডিজাইনের সব শাড়ী তৈরী হয়েছে আমাদের কারখানায়। সপরিবারে আপনার নিমন্ত্রণ।

ধীরেন বীরেন বসাক এণ্ড কোং

ফুলিয়া চটকাতলা, বয়রা, নদীয়া।

ফোন : ফুলিয়া—৩২

SAHITYA SAIKAT
Jan-March '87 Rs. 2-00
Regd. No. 42112/81 R. N. I
Postal Regd. No. WB/NDA/ (S) 73

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন.
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন ॥

কৃত্তিবাস নেই। আছে তাঁর রামায়ণ, আছে ফুলিয়া। মাঘ মাসের শেষ রোববার কৃত্তিবাসের ভিটেয় বহু অতিথি সমাগম হয়। তাঁর স্মরণে সভা বসে, বসে মেলা। আমরাও সেখানে সামিল হই।

সভা শেষ হলে বাড়ী ফেরার পালা। যাঁরা এসেছিলেন বহু দূরের পথ পেরিয়ে এক এক করে তাঁরা ফিরে যান। ফেরার পথে নতুন এক ফুলিয়াকে দেখে যেতে পারেন তাঁরা। কর্মচঞ্চল আর এক ফুলিয়া। এর আকর্ষণও একেবারে কম নয়।

না, নতুন কোন রামায়ণ নয় তবে রামায়ণের যে চরিত্র চিত্র-বিহারের মধুবনীকে আমরা সুতোয় ফুটিয়ে তুলছি শাড়ীর গায়ে—টাঙ্গাইল শাড়ী!

হ্যাঁ, আমরাই টাঙ্গাইল শাড়ীর আধুনিকতম প্রস্তুত কারক! আসুননা আমাদেব সমিতিতে!

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড
টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড

বৈঁচা বসাকপাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া।

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য □ প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশক স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৩০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

সাহিত্য পত্রিকা

□ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৩
□ এপ্রিল জুন '৮৭

"জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়। প্রভুত্ব নয় প্রবলতা নয়—বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোট বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদার ভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করবো।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বিশ্ববোধ : শান্তিনিকেতন ২)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ৩০ আই এণ্ড সি এ/নদীয়া

সাহিত্য সৈকত

বর্ষ ৬ সংখ্যা ৩ এপ্রিল-জুন '৮৭

এ সংখ্যার সূচী

- ☐ সম্পাদকীয়
- ☐ এবারকার বিধান সভা নির্বাচন ও নদীয়া জেলা
- ☐ রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত শিক্ষাগুরু : প্রশান্ত শর্মা
- ☐ জন্ম শতবর্ষে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : কাকলি ভট্টাচার্য
- ☐ ভিন দেশী এক সন্ন্যাসীর মুখোমুখি : মাধব ভট্টাচার্য
- ☐ আদিবাসী সমাজ ও নারী : ঈশানচন্দ্র মিশ্র

সেচের কাজে নলকূপে বিদ্যুতের জন্য আজই আবেদন করুন

সতেরো হাজার পাম্প সেটে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার জন্য **রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ** একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সেচের কাজে অগভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার জন্য **বিদ্যুৎ পর্ষদ** কৃষিজীবিদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পর্ষদের গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং সংশ্লিষ্ট এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ার (কনস্ট্রাকশন) অফিস থেকে প্রয়োজনীয় আবেদন পত্র দেওয়া হচ্ছে।

কৃষিজীবিদের মধ্যে যাঁরা এখনো নলকূপে বিদ্যুৎ নেবার জন্য আবেদন করেননি তাঁদের অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট পর্ষদ অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ নেবার প্রাথমিক খরচ মাত্র এক হাজার টাকা।

সেচের কাজে ডিজেল চালিত পাম্পের চাইতে বিদ্যুৎ চালিত পাম্প সেট চালানোর খরচ ঘণ্টা প্রতি সাড়ে তিন টাকা কম এবং নলকূপ চালানোর জন্য ***বিদ্যুৎ পর্ষদ*** এখন উপযুক্ত ভোল্টে অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে চালু রাখতে পারেন। সম্পূর্ণ সফল। রাত্রিবেলায় বিদ্যুৎ-এর চাহিদা কমে যায় তাই রাত্রি দশটার পর কৃষিক্ষেত্রে অনায়াসে বিদ্যুৎ চালিত পাম্পসেট বিদ্যুৎ চালিত পাম্পসেট চালিয়ে আরো লাভ, আরো বেশী ফলন তুলুন।

আর দেরী না করে আজই নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করুন।

প শ্চি ম ব ঙ্গ রা জ্য বি দ্যু ৎ প র্ষ দ

পশ্চিমবাংলার জীবনের অংশীদার

পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক জেলা তথ্য অধিকারিকের মাধ্যমে প্রচারিত।
ক্রমিক সংখ্যা আই, এণ্ড সি, এ / নঃ ২৪/৮৬-৮৭

রূপচর্চা নারীর সহজাত ধর্ম। অঙ্গে অঙ্গে নারী বহুরূপী। তার লাবণ্য ছড়ায় চলার পথে।

আমরা পোষাকের কারবারী। বলতে গেলে শাড়ীর ব্যবসায়ী শাড়ী বুনি। নারীকে আমরা সাজাই শাড়ীতে নিত্য নতুন ফ্যাশান রুচির পরিবর্তন ঋতুর পরিবর্তন শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এসব ভেবে আমাদের শাড়ী বুনতে হয়।

এখন গ্রীষ্মকাল। টেরিন, পলিয়েষ্টার রেশম একদম অপছন্দ। পরা উচিতও না। গ্রীষ্মে চাই শুধু সুতী। মিহি সুতোয় টাঙ্গাইল শাড়ীর কাছে আর কেউ না।

গ্রীষ্মের দিনগুলোতে টাঙ্গাইল সুতীর শাড়ী পরুন। রুচিতে ফ্যাশানে বৈচিত্র্য খুঁজলে সরাসরি আসুন আমাদের কাছে। হাজার হাজার শাড়ীর ভেতর থেকে নিজের পছন্দের জিনিসটি খুঁজে নিন।

ধীরেন বীরেন বসাক এণ্ড কোং

ফুলিয়া চটকাতলা, বয়রা, নদীয়া।

ফোন : ফুলিয়া—৩২

সম্পাদকীয়

শ্রীযুক্ত প্রভাস ফাদিকার মহাশয় যখন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তখন, ১৯৮৬ এর কোন এক সময়ে তাঁর সঙ্গে ঐ জেলার পত্র পত্রিকা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল জেলার পত্র পত্রিকা-গুলোর জন্য সরকারী বিজ্ঞাপন। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সব জেলারই কিছু কিছু পত্র পত্রিকা সরকারী বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকে। এ জেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম যা ছিল তা হল এই জেলায় সাহিত্যধর্মী পত্রিকার প্রতি সরকারের কোন কৃপা দৃষ্টি ছিলনা। বিজ্ঞাপনের পুরো টাকাটাই পেতো সংবাদধর্মী মুষ্টিমেয় কয়েকটি পত্রিকা।

এটা ঠিক সাহিত্যের কারবারীরা নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশে অনেকেই অক্ষম। সেদিক থেকে সংবাদধর্মীদের ক্ষেত্রে পরিবেশ অনেকটা অনুকূল। নিয়মিত একটি সাহিত্য পত্রিকাকে ৪/৫ বছর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেকের পক্ষেই এত রাস্তা হেঁটে পৌছনো সম্ভব হয়ে ওঠেনা। মাঝ পথেই মৃত্যু ঘটে। সাহিত্য পত্রিকাগুলোর, যার প্রচলিত নাম লিটল ম্যাগাজিন তার ভবিষ্যত কি? প্রকৃত পক্ষে নিষ্ঠাবান সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলোই সর্বকালে নতুন লেখক তৈরী করে থাকে। নতুন লেখক তৈরী না হলে নতুন সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টিশীল লেখক ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সম্পদ এই ছোট ছোট সাহিত্যধর্মী কাগজগুলোর উপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল। ফাদিকার মহাশয়কে এই দিকটা নিয়ে ভাবতেই সেদিন অনুরোধ করেছিলাম। সম্ভবত ভেবেছিলেন আজ অবিশ্যি তিনি এ দপ্তরে নেই। যদিও ছ বছর নিয়মিত চলার পর 'সাহিত্য সৈকত' সরকারী বিজ্ঞাপনের তালিকাভুক্ত হয়েছে। তবু এ জন্য ফাদিকার মহাশয়কে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ নদীয়া জেলা বিজ্ঞাপন পরামর্শদাতা কমিটিকে। জেলার সাহিত্য পত্রিকাগুলোর প্রতি সরকারের উদার দৃষ্টি বর্ষিত হোক্।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধতার এক দশক

মে দিবসে নতুন করে অঙ্গীকার

১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হবার সময় থেকেই বামফ্রন্ট সরকার মেহনতী মানুষের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। শ্রমজীবী মানুষ পেলেন এক নতুন আশা ও আত্মবিশ্বাস। যার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সকল স্তরে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়েছে। এই ঐক্য ও সংহতি হল ঐতিহাসিক মে দিবসের সংগ্রামী আহ্বান।

বিগত এক দশকে শ্রম ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে সুরক্ষিত করা ও তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দান. রাজ্যের প্রধান শিল্পগুলিতে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক

চুক্তি সম্পাদন, শ্রমিক কল্যাণে নূন্যতম বেতন-আইনের প্রয়োগ কৃষি মজুরীর বৃদ্ধি এবং আরো অনেক সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ। এক নতুন শিল্প পরিবেশ আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে উন্নততর অর্থনীতি গড়ে তোলার পথ সুগম করেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সূচনা করেছে বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন গণমুখী কর্মসূচী।

প শ্চি ম ব ঙ্গ স র কা র

নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।
ক্রমিক সংখ্যা ২৯ আই, এণ্ড সি, এ। নদীয়া।

এবারকার বিধানসভা নির্বাচন ও নদীয়া জেলা

পশ্চিমবঙ্গেপ্রথম বিধানসভা নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। ১ জানুয়ারী নির্বাচন শুরু হয় এবং চলে তিন সপ্তাহ ধরে। রাজ্যের প্রায় সোয়া কোটি ভোটদাতা তাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন সে সময়।

এরপর পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হয়েছে যথাক্রমে ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮২ ও এই ১৯৮৭তে। '৮৭র ২৩ মার্চ এ রাজ্যে দশম বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল। রাজ্য জুড়ে মোট ৩, ৫৩, ৪৪, ০৪৯ ভোটদাতা তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করলেন। বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাজ্যের কর্ণধার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভাও গঠিত হয়েছে। এসব খবর কারো অজানা থাকার কথা নয়। তবু বলছি। বলার উদ্দেশ্য নির্বাচনে নদীয়া জেলার অবস্থাটা তুলে ধরা।

এ জেলায় মোট কনষ্টিটিউয়েন্সি ১৫টি। ভোটদাতার সংখ্যা ১৭৮৫৭১১ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক মাত্র কালিগঞ্জ কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া বাকী সব কটি কেন্দ্রেই সি, পি, আই, এম প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

এবারে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেন—
চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, মাধবেন্দু মহান্ত, সন্তোষ কুমার সিনহা এস. এম. ফজলর রহমান, মীরকাশিম মণ্ডল, নয়নচন্দ্র সরকার, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মিত্র, বিমলানন্দ মুখার্জী, সুকুমার মণ্ডল, বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস, গৌর চন্দ্র কুণ্ডু, সুভাষ বসু, ননীগোপাল মালাকার।

গত মন্ত্রীসভায় এ জেলার বিধায়কদের মধ্য থেকে দু'জন মন্ত্রী হয়েছিলেন। একজন বর্ষীয়ান নেতা অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় অন্যজন বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়। এবারের মন্ত্রীসভায় দু' জনই বাদ পড়েছেন এবং নদীয়া এবারে মন্ত্রীবিহীন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতগুরু

প্রশান্ত শর্মা

কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা প্রায় আত্মগোপন করেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকেন। অর্জিত সম্পদ অন্যের মাঝে বিলিয়ে দেওয়াতেই তাঁদের আনন্দ। কিছু কিছু শিল্পী আছেন প্রত্যাশাবিহীন। প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতিযোগিতা নেই, সাফল্য-ব্যর্থতার সুখ দুঃখ নেই, আছে শুধু আনন্দের স্পর্শ। মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাতেই তাঁর আনন্দ। এমনি এক শিল্পী বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। যাঁর ৮২ বছরের জীবনে আমৃত্যু সুর বেজেছিল কণ্ঠে। সে সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে কণ্ঠ হতে কণ্ঠে। এই বিষ্ণুচন্দ্রের কাছেই বালক রবীন্দ্রনাথ বসে একদিন গান শিখেছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুচন্দ্র আজ বিস্মৃত প্রায়।

বিষ্ণুচন্দ্র জন্মেছিলেন আজ থেকে ১৬৮ বছর আগে ১৮১৯ সালে নদীয়া জেলার আন্দুল কায়েংপাড়া গ্রামে। বিষ্ণুচন্দ্রের বাবা কালীপ্রসাদ ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উত্তর পুরুষ গিরিশচন্দ্রের রাজসভায় সংস্কৃতের পণ্ডিত। কালীপ্রসাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কনৌজী ব্রাহ্মণ। অনুমান করা হয় সতের শতকের কোন এক সময়ে কালীপ্রসাদের কোন এক পূর্বপুরুষ কান্যকুব্জ থেকে বাংলায় আসেন এবং প্রথমতঃ কাঁকুড়াগাছা পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর সময়ে নদীয়ার শিবনিবাস তারপর রানাঘাটের কাছে আন্দুল (আনুলিয়া) কায়েংপাড়া গ্রামে বসবাস করেন।

কালীপ্রসাদের ৫ ছেলের মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র সকলের ছোট। বিষ্ণুচন্দ্র গান শিখেছেন তাঁর দাদা কৃষ্ণপ্রসাদ, মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের সভাগায়ক দেলওয়ার খাঁ মিয়াঁ মীরণ ও রহিম খাঁর কাছে। ধ্রুপদ ও রাগ সঙ্গীতের তালিম নেন তিনি এঁদের কাছ থেকে।

১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা সঙ্গীত গাইবার জন্যে রাম-

মোহন রায় গায়ক খুঁজছিলেন। তখনই অর্থাৎ ১৮৩০ সালে বিষ্ণুচন্দ্র এবং তাঁর দাদা কৃষ্ণচন্দ্র গায়ক হিসেবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। বিষ্ণুচন্দ্রের বয়েস তখন মাত্র এগার বছর। সেই থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৭ বছর ধরে বিষ্ণুচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একটি দিনের জন্যেও সমাজে তিনি অনুপস্থিত হননি এবং তাঁর গান বন্ধ থাকেনি। একথা বলে গেছেন ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসমাজে বিষ্ণুচন্দ্রের গান শুনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুশি হয়েছিলেন এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিজের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের গান শেখাবার জন্য বিষ্ণুচন্দ্রকে নিযুক্ত করেন। দেবেন্দ্রনাথ বিষ্ণুচন্দ্রের গানের প্রশংসা করে বলেছেন—"ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইলে পর আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। 'বিগত বিশেষং' গানটি রাজার (রামমোহন রায়) অতি প্রিয় ছিল। বিষ্ণু ঐ সঙ্গীতটি মধুর স্বরে গান করতেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অন্যান্যদের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুচন্দ্রর কাছেই প্রথম গানের তালিম নেন। ঠিক নাড়াবাঁধা নয় প্রাতিষ্ঠানিক নয় তাহলেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত গুরু বিষ্ণুচন্দ্রই। রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুর বাড়ির অনেকেরই সঙ্গীতে হাতেখড়ি ওঁর হাতে। বিষ্ণুচ ছাড়াও আরো দুজন সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন ঠাকুর বাড়িতে। তাঁদের একজন যদুভট্ট অন্যজন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। বিষ্ণুচন্দ্রের পর ওঁরা ঠাকুর বাড়িতে নিযুক্ত হন। বিষ্ণুচন্দ্র ঠাকুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের ব্রহ্মসঙ্গীত শেখাতেন প্রতি রবিবার। তাঁর শেখাবার পদ্ধতি ছিল একটু আলাদা। তাতেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় তা বলেছেনও। 'ওদিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হল। বিষ্ণু যে গান হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোন নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন।

সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নিচের তলায়। একটা নমুনা দিই—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে
আবার উল্কি পরা যেমন তেমন
লাগিয়ে দিল ভেল্কি—
ঠাকুরঝি
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি—
ঠাকুরঝি!

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়াম সুর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধানো, তারপরে হাল্কা গোছের হিন্দি গান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন ছেলেমানুষী ছেলেদের মনের আপন জিনিস আর ঐ হাল্কা বাংলাভাষা হিন্দি বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজেও জায়গা করে নেয়। তাছাড়া এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না, আপনা আপনি নাড়ীতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়—এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল। কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কলটেপা সুরের গোলামি করিনি।'

'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ আর এক জায়গায় বলছেন—আমার দোষ হচ্ছে শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশিদিন চালাতে পারেনি। ইচ্ছেমত কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই।' মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তাহলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারতেন না। কেননা, সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রাহ্মসঙ্গীত আউড়েছি।'

শুধু গায়ক নন, বিষ্ণুচন্দ্র একজন সুরকারও ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যত গান তিনি গেয়েছেন তার মধ্যে বহুগানে সুরও দিয়েছেন। অনুমান করা হয় প্রায় আড়াই হাজার গান তিনি উপাসনা সভাতেই গেয়েছেন।

গান গেয়ে প্রতি মাসে ব্রাহ্মসমাজ থেকে চল্লিশ টাকা করে পেতেন বিষ্ণুচন্দ্র। চাকরির জীবন যত বাড়তে লাগল মাইনের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে লাগলো তাঁর। চল্লিশ থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে দশ টাকায় এসে ঠেকলো। এর কারণ অবিশ্যি ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক দৈন্যতা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো অন্য জায়গায় অনেক বেশি টাকা রোজগারের সুযোগ পেয়েও বিষ্ণুচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে যান নি।

বিষ্ণুচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন ঠাকুর পরিবারের হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মসমাজে যখন তাঁর মাইনে কমে গেল এবং অর্থকষ্টে পড়লেন, হেমেন্দ্রনাথ তখন বিষ্ণুচন্দ্রকে বললেন তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাদের গান শেখাতে। বিষ্ণুচন্দ্র তাই করেছিলেন এবং হেমেন্দ্রনাথ তাঁকে মাসে কুড়ি টাকা করে দিতেন।

আন্দুল কায়েত পাড়ার বাড়ি ছেড়ে যাবার পর বিষ্ণুচন্দ্র আর কোনদিন তাঁর জন্মভিটেয় এসেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ১৮৯৭ সালে ব্রাহ্মসমাজের কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরও তিনি আর আন্দুলে ফেরেন নি। ২৪ পরগণা জেলার হালিশহরে একটি বাড়ি করে সপরিবারে বসবাস করেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া দেখা দিলে হালিশহর ছেড়ে ফের কলকাতায় ফিরে যান এবং একটি ভাড়া বাসায় জীবনের বাকি দিনগুলো কাটান। ১৯০০ সালের ৫ মে বিষ্ণুচন্দ্রের মৃত্যু হয়। আজ তাঁর বংশের কেউ আছেন কিনা জানা নেই। ভিটে মাটি নিশ্চিহ্ন। বিষ্ণুচন্দ্রও বিস্মৃত প্রায়।

জন্ম শতবর্ষে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কাকলি ভট্টাচার্য

মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সাক্ষাতিক পরিচয় কোনদিনই ছিলনা। তবু মোহিতলাল মজুমদার যতীন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। মোহিতলাল মনে করতেন রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি।

বর্তমান বছরটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর জন্মের শতবর্ষ। এখন থেকে একশ' বছর আগে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্ম হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন, ১৩ই আষাঢ় ১২৯৪ সালে তাঁর মামার বাড়ি বর্ধমান পাতিলপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত ও মায়ের নাম মোহিত কুমারী দেবী। দ্বারকানাথের বাড়ি নদীয়া জেলায় হরিপুর গ্রামে। যতীন্দ্রনাথ বার বছর বয়স পর্যন্ত হরিপুর গ্রামে থেকে স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। সেখান থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে কলকাতায় তাঁর কাকার কাছে থেকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে পড়াশুনো শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি পর পর বিউবনিক প্লেগ ও টাইফয়েডে ভুগে খুব রুগ্ন ও শীর্ণ হয়ে গেলেন। এরপরে মাস ছয়েক হরিপুরে থেকে স্বাস্থ্যের উন্নতি না হতে বালেশ্বরে তাঁর বাবার কাছে যান এবং পড়াশুনো শুরু করেন। এ সময় কবির স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বাবার চাকরী চলে যাওয়ায় তাঁকে সেখানকার বাস গুটিয়ে পুনরায় কলকাতায় আগের স্কুলে এসে ভর্তি হতে হল।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ষোল বছর বয়সে তিনি এনট্রান্স পাশ করেন। এরপরে জেনারেল এ্যাসেম্বলি (বর্তমান স্কটিশচার্চ) কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯০৫ খৃঃ এফ. এ. পাশ করেন।

কবির সখ শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হবেন। একদিকে ভগ্নস্বাস্থ্য অপর দিকে কলেজের সামনে পদ্মপুকুর তাঁকে

আকৃষ্ট করছে। তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন "অভিভাবকের কোন বালাই নেই তার উপর হষ্টেল প্রাঙ্গনের পুকুরে যে পদ্ম ফুটে থাকে তা' তুলনাহীন। পদ্মের লোভেই যতীন অভিভাবকদের মত করিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। এই ব্যাপারে তার কবিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আমাদের মনে প্রথম জাগে।"

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিজীবন ঠিক কতবছর বয়স থেকে শুরু তা' সঠিক জানা যায় না। তবে শিবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময় থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। সে সময় কিছু গানও লেখেন। তবে সে লেখা তেমন পাকা-পোক্ত নয়। ছোট বেলায় হরিপুরে থাকার সময় কবি রাত্রিবেলা আশপাশের গ্রামে যাত্রা-পালাগান তরজার লড়াইইত্যাদি শোনার জন্য প্রায়ই যেতেন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। কলেজ জীবনে নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য ও হেমচন্দ্রের কবিতার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। শিবপুরে থাকাকালীন যতীন্দ্রনাথ প্রথম রবীন্দ্র কাব্য পাঠ করে মোহিত হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের একজন বিশিষ্ট অনুরাগী পাঠক হয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে কবির লেখনী দিয়ে কিছু অক্ষম কাব্যের প্রকাশ ঘটলেও পরবর্তীকালে বহু সফল কাব্যের জন্ম দিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ মরীচিকা বাংলা ১৩৩০ সনে প্রকাশিত হয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মাত্র কুড়ি বছর কয়েকমাস বয়সে বিয়ে হয় হাজারিবাগের আইনজীবি চারুচন্দ্রগুপ্তের মেয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে। কবির লেখা তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মরুমায়া' (১৩৩৭) স্ত্রীর নামেই উৎসর্গ করেন। স্ত্রীকে নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেন তিনি। যেমন—

"হে আমার জ্যোতি হে আমার সতী,
গৃহিনী, সচিব, সখী হে প্রিয়া।"

অথবা

'প্রভাতে উঠিয়া সম্বরি' বাস
হাসিয়া সলাজ হাসি
পুষ্পের প্রায় পড়ি মোর পায়'
নীরবে কহিলে 'আসি।'
(শুভ ফাল্গুনী তিথি, 'সায়ম')

সায়ম কাব্যের কয়েকটি এবং ত্রিযামা কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই জ্যোতির্ময়ী দেবীর উদ্দেশ্যে লেখা। কবি প্রত্যেকটি কবিতা লিখে স্ত্রীকে আগে পড়িয়ে শোনাতেন তারপরে ছাপতে দিতেন।

ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে কবি ঢাকা গেলেন ট্রেনিং নিতে, সেখান থেকে ফিরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নদীয়া জেলা বোর্ডের ওভারসিয়ার নিযুক্ত হলেন। পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলা বোর্ডের ডিস্ট্রিকট্ ইঞ্জিনীয়ার হন।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন কতকটা ভিন্নজাতের কবি। তিনি লিখতে বসে কোন কবিতাই একদিনে শেষ করেননি। ভাবনা চিন্তা করে, অদল বদল করেছেন বার বার এবং কয়েকদিন পরে সম্পূর্ণ করেছেন তা। যতীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা সমসাময়িক কবিদের থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী। তাঁর প্রথম দিকের লেখা কবিতায় কল্পনার অবগাহন নেই-ই বলতে গেলে। সব কবিতাই প্রায় বড় বেশি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা। কবি শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের ছেলে হয়েও রুক্ষ কঠিন মরুভূমির সাধনা করেছেন জীবন ভর। তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামেও মরুভূমি কথাটি দেখা যায় বারবার। কবির লেখা কিছু কবিতা সম্পূর্ণ অলঙ্কার বর্জিত অনুভূতি ও কৌতুক চমকের রসে ভরপুর যা কল্লোল যুগে প্রবচন হিসেবে মানুষের মুখে মুখে ফিরতো ও উদ্ধৃতি স্বরূপ ব্যবহৃত হত। যেমন—

'ঝিম ঝিম নিশিচন্ত
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন্‌ত।

অথবা

"চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে?"

আর একটি কবিতা—

"মরণে কে হবে সাথী
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারেনা বারোটার বেশি রাতি।"

অনেকে মনে করলেও যতীন্দ্রনাথ কখনই রবীন্দ্র বিরোধী

কবি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের পূজারী তিনি বরাবরই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সকল যতীন্দ্রনাথেব কাছে ধ্যানেরি ধন। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে তাঁর পূজার ডালির ফুলসম কয়েকটি কবিতা—'কবি প্রণাম', '২৫শে বৈশাখ', '২২শে শ্রাবণ', কবির ছবি, রবিন্দ্রপ্রণাম ইত্যাদি রবীন্দ্র প্রয়াণের পর অন্যান্য কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের ২২শে শ্রাবণ কবিতাটিই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে বিবেচিত হয়েছিল।

"হে কবি আছ কি নাই—
সে কথা জানিতে নাহি চাহি
আমরা তোমার তরে কাঁদি
তোমারে স্মরিয়া ছন্দ ফাঁদি,
তব গান গাই গুণী
যন্ত্রে তব কণ্ঠ শুনি,
তোমার ছবিরে দিই মালা।
তোমার লিখন পড়ি,
তোমারে প্রণাম করি
তোমাতেই লই ভরি অন্তরের ডালা।"

সায়মের রবি প্রণাম কবিতায় দেখি—

'সেই অহঙ্কারে আজ
ভুলিয়া আসন্ন লাজ
আমার সাঁঝের পাখি তব
"জয়তু প্রসন্ন রবি
পাখীর প্রাণের কবি"
ক্ষীণকণ্ঠ উর্ধ্বে তুলি' কব।
এ পঞ্জরে রক্তমাখা
যে পাখী ঝাপটে পাখা
বন্ধন বেদনে অবিরাম,
ছিন্নতার ওষ্ঠপুটে
যে গান কাঁদিয়া উঠে
সেই গানে করে সে প্রণাম!'

মানুষ হিসেবে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সহজ সরল, নিরহংকারী, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ রসিক ও স্বল্পবাক। কবি কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন বহু কবি ও গুণীজনের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং এ সমস্ত যোগাযোগ তাঁর কাব্য চর্চার ক্ষেত্রকে আরও সরস অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল নিঃসন্দেহে।

কবি সুগায়ক ও সুঅভিনেতা ছিলেন। কৃষ্ণনগরে থাকা কালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সঙ্গে কবির যোগাযোগ ঘটে এবং ওখানকার সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। বহু কবি বন্ধুর বন্ধুত্ব পাওয়ার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী তিনি কবির 'মিতা' ছিলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যুতে এবং তাঁর নিজের শারীরিক অসুস্থতার জন্য চাকরী ছেড়ে দিয়ে কিছুটা স্বদেশী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। তিন বছর পরে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার রাজ এষ্টেটের চাকরীতে বহাল হলেন। পরে কলকাতা এবং শেষে বহরমপুরে অফিস বদলীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বদলী হন।

এই সময় তাঁর কবিতা লেখা কিছুদিন বন্ধ ছিল। পরে তাঁর লেখার ধারা গেল বদলে। 'মরীচিকা' থেকে 'মরুমায়া' পর্যন্ত তাঁর কবিতার মধ্যে ছিল তীব্র বেদনা। এর পরে 'সায়ম' থেকেই তাঁর জীবনের কাব্যধারা গেল পাল্টে। তাঁর কবিতার মধ্যে ধীরে ধীরে রোমান্টিকতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল। এরপর তিনি বৈচিত্র্যময় ছন্দে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কবিতা লিখতে শুরু করেন।

'মরীচিকা' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই বইয়ের কবিতা-গুলির রচনাকাল কবির তেইশ বছর বয়স থেকে ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত। এরপর সাঁইত্রিশ থেকে একচল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা হয়েছিল 'মরুশিখা'। বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছরের মধ্যে 'মরুমায়ার' কবিতাগুলি। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সে লেখেন 'সায়ম' কাব্য। এরপর 'ত্রিযামা' ও 'নিশান্তিকা'।

যতীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৬টি। 'মরীচিকা' (১৩৩০), 'মরুশিখা' (১৩৩৪) 'মরুমায়া' (১৩৩৭) 'সায়ম' (১৩৩৮) এবং 'ত্রিযামা' (১৩৫৫) তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়। 'নিশান্তিকা' (১৩৬৪) কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কবি চাকরী থেকে অবসর নেন। এরপর তিন বছর বহরমপুরেই তিনি ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর হিজলীতে কবিপ্রাণ এ ব্যস্ত মুখর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অবসর নিয়ে চলে গেলেন কোন অচীন নক্ষত্রলোকে। জ্যোতির্ময়ী দেবী আরও আট বছর জীবিত ছিলেন। কবির তিন ছেলে এবং চার মেয়ে। যতীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব একসময় তরুণদের ওপর গভীর ভাবে পড়েছিল। যতীন্দ্রনাথের অনুকরণে তাঁরা কবিতা লিখতে শুরু করেন। যতীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

যতীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ইংরেজী ও সংস্কৃত অনুবাদের কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে গীতার অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

অবসরকালে কবির সাধ ছিল বাল্য ভূমি হরিপুরে এসে অবসর জীবন যাপন করবেন। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠেনি। ইঞ্জিনীয়ার কবি একসময় দুঃখ করে লিখেছেন—

ইট কাঠ চুণ বালি আনাইয়া গাড়ী গাড়ী
সারাটা জীবন শুধু গাঁথিনু পরের বাড়ি।
কত দুশ্চিন্তাই ঘটাতে বাসের সুখ,
আলো হাওয়া জল ড্রেন,—পাছে কোন হয় চুক।
সে সব বাড়িতে মোর কোন অধিকার নাই,
পথে পথে খুঁজি আজ মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।

ভিনদেশী এক সন্ন্যাসীর মুখোমুখি

মাধব ভট্টাচার্য

হৃষীকেশের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল মায়াপুরে, ইস্‌কন মন্দিরে। নেড়ামুণ্ডি গেরুয়াধারী সপ্রতিভ যুবক হৃষীকেশ। আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়া তার দেশ। মাতৃভাষা ইংরেজী। হৃষীকেশের মা-বাবার দেওয়া নাম হেনরী ডক্টরস্‌কি। কিন্তু সে নাম আর এখন উচ্চারণ করেনা হৃষীকেশ। মা-বাবার সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ নেই অনেকদিন। হেনরী এখন হৃষীকেশ দাস—সন্ন্যাসী। পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় ইসকনের যে সুবিশাল নব বৃন্দাবন মন্দির আছে, হৃষীকেশের বর্তমান বাস এখন সেই মন্দিরেই।

আরও একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার নাম এনড্রুলাইকা। মিস এনড্রুলাইকা এসেছিলেন নিউইয়র্ক থেকে। একটা ট্রাভেলিং এজেন্সিতে কাজ করেন তিনি। ইসকনের সদস্য হলেও সন্ন্যাস নেননি এনড্রুলাইকা। চাকরী আছে, ঘর সংসার আছে। এ সব রেখেও ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ তার। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা।

এনড্রুলাইকার হাতে সময় ছিলনা, তাই বেশি সময় কথা হয়নি। মাত্র সাতদিনের ছুটি। এরই মধ্যে মায়াপুর কলকাতা ঘুরে ফিরে যেতে হবে তাকে নিউইয়র্কের সেই ট্রাভেলিং এজেন্সিতে—চাকুরীস্থলে।

হৃষীকেশের তত তাড়া নেই। তার হাতে সময় আছে। সময় নিয়েই সে এসেছে। ভারতের ধর্মস্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার ইচ্ছা তার। বইয়ে পড়েছে কিছু কিছু। এবারে নিজের চোখে হৃষীকেশ এ দেশটাকে দেখতে চায়। তা ছাড়া হৃষীকেশের পিছু টান নেই। ঘরে ফেরার তাড়া নেই। তার তো ঘর নেই সংসার নেই, অপেক্ষা করে থাকার মত কেউ নেই।

হৃষীকেশ আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেশ নিবিড়

হয়ে ওঠেছিল। ভর দুপুরে দুজন মিলে মন্দিরের এক কোণে গাছের ছায়ায় বসেছিলাম। কৌতূহল ছিল আমার। হৃষীকেশকে তাই জিজ্ঞেস করলাম-হৃষীকেশ, যদি কিছু মনে না কর তো একটা প্রশ্ন করবো ?

হৃষীকেশ বলল—বলো।

—তুমি সন্ন্যাসী হলে কেন বলবে ?

অনেক সময় ধরে মনে মনে কি জানি কি ভাবল হৃষীকেশ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—কৃষ্ণের ইচ্ছায়, এখন কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রেম কৃষ্ণই আমার ভালবাসা। তাঁর কাছেই আমার সব চাওয়া-পাওয়া তাঁর কাছেই আমার আশ্রয়। এর থেকে বড় কোন আকর্ষণ আজ আর আমার কাছে নেই। —একদিন ছিল, যখন মা ছিলেন, বাবা ছিলেন ভাই বোন ছিল এবং আরো একজন। একজনের কথা উচ্চারণ করেই হৃষীকেশ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। কথা থামিয়ে দিল।

আমি বললাম—থামলে কেন ?

হৃষীকেশ বলতে লাগল—মেয়েটি ছিল আমার প্রেমিকা। আমাকে সে ভালবাসত। একসঙ্গে আমরা পড়াশুনো করেছি, গান গেয়েছি, বাজনা বাজিয়েছি. খেলাধুলো করেছি। মেয়েটির নাম ছিল ক্যারল। ওকে বিয়ে করবো এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ে করা হয়নি। ক্যারল মনে মনে খুব আঘাত পেয়েছিল। জীবনটা কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। —এতটুকু বলে উদাস চাউনি মেলে তাকিয়ে রইল হৃষীকেশ। এক সময় চোখ নামিয়ে বলল—থাক্ ও কথা !

স্মৃতির ভারে হৃষীকেশকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে দুজনেই চুপচাপ বসে। কারও মুখে কোন কথা নেই। আমিই ফের বললাম কেন তুমি সন্ন্যাসী হলে তা কিন্তু বললে না।

হৃষীকেশ বলল-হ্যাঁ, যৌবনের শুরুতে ক্যারলের প্রেমে পড়েছিলাম। তখন মনে হতো ক্যারলকে ছাড়া বাঁচা অসম্ভব।

একদিন তার থেকেও বড় প্রেম টেনে নিল। ক্যারলের বন্ধন মুক্ত হয়ে গেলাম। কী করে হলাম তা' সঠিক বলতে পারবো না। নিজের অজ্ঞাতেই সে কাজটা ঘটে গিয়েছিল। আমি যেন বুঝতে পারছিলাম মানবিক এই প্রেমের বন্ধন থেকে অদৃশ্য কৃষ্ণ প্রেমের বন্ধন অনেক দৃঢ়। কৃষ্ণর প্রেমে পড়ে গেলাম আমি।

হৃষীকেশ বলল-আমার মা-বাবা ছিলেন আমেরিকাবাসী। বাবা একটি ইলেকট্রিক কোম্পানীতে শ্রমিকের কাজ করতেন। মা খুব কষ্ট করে তাঁর অকৃত্রিম যত্ন ও আদরে আমাকে বড় করে তুলেছিলেন।

আমি স্কুলে যেতাম। স্কুল থেকে এসে প্রতি সন্ধ্যায় গীর্জায় যেতাম পিয়ানো বাজাতাম। আমার মার আমার প্রতি খুব উচ্চাশা ছিল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাপুরণ আমি করতে পারিনি। তবে আমার এই বিশ্বাস আছে, যে আমি ভুল করিনি। মা আমাকে ঠিকই বুঝতে পারবেন। হৃষীকেশ বলল ভারতীয় দর্শনের ওপর সামান্য পড়াশুনো ছিল আমার। গীর্জার পাদ্রী উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পড়তে শুরু করলাম ধীরে ধীরে ইসকনের সঙ্গে যোগাযোগ হল।

নববৃন্দাবন মন্দিরে গিয়ে ভাল লেগে গেল। কার যেন অনুচ্চারিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম-এই ই তোর ঘর। শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শ্রীল ভক্তিপদর পায়ে নিজেকে সমর্পন করে দিলাম। তিনিই আমার গুরু। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

আমার মনে হত মানুষ পশু উভয়ইত আহার করে, ঘুমোয়, জীবিকার তাগাদায় কিছু একটা করে, রিপুর কামনা বাসনা মেটায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তা হলেও একমাত্র মানুষই পারে আত্মাকে উপলব্ধি করতে।

আমি সম্পদ চাইনা, সুন্দরী নারী চাইনা, বিখ্যাত পিয়ানো বাদক বা সঙ্গীতজ্ঞ হতে চাইনা, আমি শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন চাকর হতে চাই। এই চাওয়াই আমার জন্ম থেকে জন্মান্তরের চাওয়া।

আমি ক্যারলকে বললাম-ক্যারল, কামনা-বাসনার মানুষ হতে চাইনা আমি আমি চৈতন্য মহাপ্রভুর সাধক হতে চাই। চৈতন্যের উপাসক। -আমি হতে চাই ঈশ্বরের একজন প্রেমিক্।

ক্যারলের হাত দু'টো ধরে আমি তাকে অনুরোধ করলাম তুমিও এস ক্যারল আমার সঙ্গে, এস এই নব বৃন্দাবনে। আমার প্রিয়তমা বিশ্বাসী স্ত্রী হয়ে থাকবে তুমি এখানে। এস আমরা দু'জন আমাদের সকল সত্তা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি।

আমি আমার কথা শেষ করে ক্যারলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম উত্তরের প্রত্যাশায়।

ক্যারলের মুখে কোন কথা নেই। তার শরীর কাঁপছিল। সে তার মুখটা আমার বুকের মধ্যে গুঁজে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠলো।

আমি আমার দু' বাহুতে ক্যারলকে চেপে ধরে খুব শান্তভাবে বললাম ক্যারল, তুমি কেঁদোনা. কেঁদোনা ক্যারল দুঃখ করোনা সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো।

আমার অন্তরাত্মাও কাঁদছিল। আমার কী করণীয় আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলামনা সেই মুহূর্তে। এক হয়, আমি আমার পরিবার আমার শিক্ষক আমার প্রেমিকার মাঝে থেকে তাদের তৃপ্ত করতে পারি নয়তো তাদের বন্ধন মুক্ত হয়ে আত্মার আধার ভগবান শ্রীচৈতন্যর উপাসক। কিন্তু দু'টোকে একসঙ্গে কিছুতেই নয়। আমার চোখ বেয়ে জল নেমে এলো। অতীত স্মৃতি এক এক করে সব ভেসে উঠতে লাগল। আমার যেন মনে হতে লাগল আমি আর বাঁচবোনা। সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আমার সামনে আমার গুরুদেবের মূর্তি ভেসে উঠলো হঠাৎই। আমি যেন মুহূর্তের মধ্যে বুঝে গেলাম আমার অদৃষ্ট আমার ভবিষ্যৎ।

আর একটিও কথা নয়। ক্যারলের কপালে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ক্যারলকে শেষবারের মত একবার তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম ক্যারল সেই সোফাতেই

বসে আছে। বাদামী রঙের অগোছাল ঘন চুলে তার মুখ ঢাকা। চোখ দু'টো কান্নায় ভেজা। ক্যারলকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলাম আমি।

সেই শেষ দেখা। আজ থেকে ৮ বছর আগেকার কথা। তখন থেকেই আমি এই নব-বৃন্দাবনে আছি। কৃষ্ণই আমার প্রেম কৃষ্ণই আমার ভালবাসা।

হৃষীকেশ বলল—জানো, মা, বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হয় এখন কিন্তু ক্যারলের সঙ্গে আর দেখা হয় না। সেই শেষ দেখা হয়েছিল। বলতে বলতে হৃষীকেশের গলার স্বর ধরে এলো। খুব ধীরে ধীরে বলল জানো ক্যারল মারা গেছে। কথাটা শেষ করেই হৃষীকেশ আনমনে তাকিয়ে রইল কিছু সময়।

এরকম একটা কথা শুনবো ভাবিনি। শুনে আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেল।

হৃষীকেশ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—সেই যে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল, পারেনি—তার 'ক' দিন বাদেই জলে ডুবে মারা গেছে ক্যারল।

হৃষীকেশ বলল—আট বছর পেরিয়ে গেছে। ক্যারলের কথা মনে হলে কষ্ট হয় আজও। ঈশ্বরের কাছে ওর আত্মার শান্তি কামনা করি। কিন্তু আমারও তো কিছু করার ছিল না। এখন আমার জীবনের পথ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র ঈশ্বরই আমার প্রেম। তাঁকে পাওয়াই বড় পাওয়া।

আদিবাসী সমাজ ও নারী

ঈশান চন্দ্র মিশ্র

সমাজে নারীদের অধিকার দায়িত্ব ভূমিকা এ সব নিয়ে বহু আলোচনা, বিতর্ক দিনরাত দৈনিক কাগজে পত্রিকায় চোখে পড়ে। নারী মুক্তি প্রসঙ্গে নতুন আইন কানুন ও প্রথা চালু হচ্ছে। নারী স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কোনো জ্ঞান বা নতুন কিছু পথ প্রদর্শনের ব্যাপারে আমি মোটেই যাচ্ছিনা। আদিবাসী সমাজে নারীদের মর্যাদা বোধ ও স্বাধীনতা কতখানি কয়েম সে বিষয়ে একটু আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ এ মানতেই হবে যে আদিবাসী মহিলারা অনেকাংশে কর্মঠ। যেহেতু শিক্ষার হার ভীষণ কম যে কোনো ধরণের শারীরিক পরিশ্রম ওদের কাছে সহজ ব্যাপার। কখনোই কর্ম বিমুখ নয়। এজন্য কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থোপার্জনে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধার অধিকারী। যার ফলে স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত প্রকাশে তারা দ্বিধাবোধ করেনা এবং উপার্জনশীলা বলে ন্যায় সঙ্গত ভাবে সংসারে নিজস্ব অধিকার জারী রাখার দাবী রয়েছে। আদিবাসী সমাজ কিন্তু মেয়েদের এ ব্যাপারে পেছনে ফেলে রাখেনি। কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে অধিকারের দায়িত্ব বোধ পাশাপাশি বয়ে নিয়ে চলেছে।

সকাল হলেই মেয়েরাও কাজে বেরিয়ে গেল সে অবিবাহিতা কিংবা জায়া বা জননী যা-ই হোক না কেন। জননীর সন্তান ধারনটা কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। ফিরলো সেই সন্ধ্যায়। দিনান্তে ক্লান্ত রুক্ষ শরীর ঝরঝরে তাজা হয়ে উঠলো ঝরণার জলে তারপর শুরু হলো সংসারের দায়িত্ব পালন এবং তা মোটেই গুরুভার নয় হাসিমুখে তা করতে অভ্যস্ত। সংসারের প্রতি দায়িত্ববোধ কোন অংশে কম নয়। কিন্তু অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রাণ চঞ্চলতা ও অনাবিল আনন্দের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার যেন ওদের প্রাণের মধ্যে। তাই এত পরিশ্রমের পরও ওদের খুশী নিস্তেজ হয় না, ওদের

ভালবাসা ঝিমিয়ে পড়েনা, প্রেম দ্বিখণ্ডিত হয় না—হাঁড়িয়ার বস ওদের মনে আবেশ আনে শুরু হয় নাচ-গান মাদলের দ্রিম দ্রিম তালে তালে। পরিচ্ছন্ন পোষাক, মাথায় ফুল মুখে সরল হাসির অফুরাণ রেশ। সাজগোজের ব্যাপারে কিন্তু মেকী কৃত্রিমতা নেই, সে কাজে যাওয়ার সময় বা নাচ-গানের সময় যে কোন সময়ই রুচিশীলতা সত্যিই আমাদের অত্যাধুনিকতাকে বিদ্রূপ করে যেন।

নারী মর্যাদায় আদিবাসী সমাজ কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে। নারীর শ্লীলতাহানি ব্যভিচার বা কোন রকম মর্যাদাহানি এদের মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত। খোলামনে নারীপুরুষে মেলামেশাই এর সুফল। আদিবাসী মেয়েরা নিজেদের সমাজের পুরুষদের কাছে কোনোরকম অশালীন আচরণের শিকার হয়েছে এ অত্যন্ত বিরল। অন্য কোনো সমাজের পুরুষেরা আদিবাসী মেয়েদের মর্যাদাহানি করলে ওরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে নারীর প্রতি অবমাননা ওরা কোনোমতেই সহ্য করতে পারে না। সাধারণত আমাদের সমাজে পুরুষ আগে চলে গুটি-গুটি পায়ে নারী তাকে অনুসরণ করে কিন্তু আদিবাসী সমাজে নারী শুধু অনুসরণকারিনী নয় পাশাপাশি এগিয়ে চলার অংশীদার। আর্থিক অসঙ্গতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ কারণে আদিবাসী সমাজ হয়তো দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করছে না কিন্তু এদের নীতিবোধ, নৈতিক চেতনা, মর্যাদাবোধ—আমাদের কাছে অনেকাংশে শিক্ষামূলক।

এদের মাঝে প্রেম আছে সরলতা উদারতা ওদের জীবনের মস্ত বড়ো সম্বল। বধূহত্যা, নারী নির্যাতন ওদের কুষ্ঠিতে লেখেনি। আদিবাসী সমাজে নারী শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনকারী যন্ত্র নয়। তার মর্যাদা প্রকৃত শ্রদ্ধার আসনে। এবং এই সমাজে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে ঘরেই হোক বা বাইরেই হোক।

ইতিহাসখ্যাত ঐতিহ্যমণ্ডিত জেলা নদীয়া দর্শন করুন

কৃষ্ণনগর— মৃৎশিল্প ও মিষ্টান্ন শিল্প শুধু রসনাতৃপ্তিকরই নয়, আজও আকর্ষণীয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজধানী, প্রাচীন জনপদ। এখানে আছে অতীত ও বর্তমানের অনুপম দর্শনীয় অনেক কিছু।

নবদ্বীপ—শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি, সংস্কৃতিচর্চার বাগীশ্বরী সাধনপীঠ, বাংলার অক্সফোর্ড।

শান্তিপুর—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের জন্মস্থান, অসামান্য বয়নশিল্প আর রাসমেলা।

ফুলিয়া—বাংলা রামায়ণকার আদিকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান।

উলাবীরনগর—পোড়ামাটির ভাস্কর্য মণ্ডিত মন্দিরের নানা রীতি।

বল্লালঢিপি—প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে বৌদ্ধ বিহার স্তূপ আবিষ্কৃত।

পলাশী—স্বাধীনতার সূর্য গমনস্থল।

কল্যাণী—আধুনিক শিল্পনগরী ও কাছাকাছি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়।

শিবনিবাস—পূর্বভারতের সর্ব বৃহৎ কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ এবং সতীসহ রামচন্দ্রের অনুপম স্মৃতি দর্শনীয়।

আই এণ্ড সি এ ন/২০ ৮৬-৮৭

[নদীয়া জেলা তথ্যআধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।]

বছর বছর নববর্ষ আসে। নববর্ষের প্রথম দিনটাকে আমরা আরো অনেকেরই মত স্বাগত জানাই। বছরের প্রথম দিনে নতুন খাতা মহরত করি। বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীরা আসেন। আসেন আমাদের গ্রাহকরা। আসলে এটাই বড় পাওয়া। সকলকে একসঙ্গে পাওয়া। সকলের সান্নিধ্য লাভ করা। প্রয়োজনে ত আমরা একে অন্যের কাছে যেরেই থাকি। আমরা চাই প্রয়োজন ছাড়াও আমাদের কাছে শুভানুধ্যায়ীরা আসুন।

দৃঢ় হোক বন্ধন। সোনার শেকলে বাঁধতে চাই আমরা সকলকে।

এ, টি, জুয়েলার্স

ফুলিয়া রেলবাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া
[মাছ বাজারের সন্নিকট]

প্রোঃ শৈলেন কুমার কর্মকার

[বিঃ দ্রঃ—আমাদের দোকান বুধবার পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে]

SAHITYA SAIKAT
April-June '87 Rs. 2-00
Regd. No. 42112/81 R. N. I
Postal Regd. No. WB/NDA/ (S) 73

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন ॥

কৃত্তিবাস নেই। আছে তাঁর রামায়ণ, আছে ফুলিয়া। মাঘ মাসের শেষ রোববার কৃত্তিবাসের ভিটেয় বহু অতিথি সমাগম হয়। তাঁর স্মরণে সভা বসে, বসে মেলা। আমরাও সেখানে সামিল হই।

সভা শেষ হলে বাড়ী ফেরার পালা। যাঁরা এসেছিলেন বহু দূরের পথ পেরিয়ে এক এক করে তাঁরা ফিরে যান। ফেরার পথে নতুন এক ফুলিয়াকে দেখে যেতে পারেন তাঁরা। কর্মচঞ্চল আর এক ফুলিয়া। এর আকর্ষণও একেবারে কম নয়।

না, নতুন কোন রামায়ণ নয় তবে রামায়ণের যে চরিত্র চিত্র-বিহারের মধুবনীকে আমরা সুতোয় ফুটিয়ে তুলছি শাড়ীর গায়ে—টাঙ্গাইল শাড়ীর!

হ্যাঁ, আমরা টাঙ্গাইল শাড়ীর আধুনিকতম প্রস্তুত কারক! আসুননা আমাদের সমিতিতে!

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়নশিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড
টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড

তাঁতঁচা বসাকপাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া।

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ☐ প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, বেলিকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

সাহিত্য পরিক্রমা

বর্ষ ৬ □ সংখ্যা ৪ □ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

এ সংখ্যার সূচী

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর : ১
(সম্পাদকীয়)
বৈরাগী (গল্প) : কাকলি ভট্টাচার্য ৫
কবি নবীনচন্দ্র : প্রশান্ত শর্মা ১০
নবীন প্রসঙ্গ : গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ১১
প্রাচীন গুপ্তিপাড়া, মন্দিরে
টেরাকোটার অমূল্য সম্পদ : মাধব ভট্টাচার্য ১৬

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর

কোন মানুষই পৃথিবীতে পরাধীন-ভাবে বেঁচে থাকতে চায়না। সব মানুষই চায় তার স্বাধীন সত্তাটাকে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে।—এই চাওয়াটা মৌলিক অধিকারবোধেরই একটি চাওয়া, এই চাওয়াটা সুস্থতারই একটি চাওয়া।

সব মানুষের জীবনে এই চাওয়া-পাওয়ার পূর্ণতা আসে না। আজ থেকে দু'শ আড়াইশ' বছর আগে যারা এদেশের মাটিতে বাস করে গেছেন তারা ছিলেন বৃটীশ শাসিত পরাধীন ভারতবাসী। পরাধীনতার গ্লানি মুছে তারাই দেশের মানুষকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। সেই স্বাধীনতার আজ চল্লিশ বছর।

চল্লিশ বছর সময়টা নেহাৎ কম নয়। চল্লিশ বছরের জীবনে ভারতের ইতিহাসে সংযোজন ঘটেছে বহু ঘটনার। এই দীর্ঘ সময় সীমা পেরিয়ে এলেও 'স্বাধীনতার' সুফল এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে এই সঙ্গত প্রশ্নটি তুলে ধরলেই বিতর্ক বেঁধে যেতে পারে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়ে এক কথায় বলা যায় ভারতবর্ষে স্বাধীনতাত্তোর রাজনীতি মানুষের মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে পারেনি। আর এই দেশাত্মবোধের অভাব মানুষকে বা একটা দেশকে যেখানে ঠেলে দেয়-অর্থাৎ দলীয় রাজনীতির কোন্দলে তাই হচ্ছে আজ দেশ জুড়ে। এর ফল যে নির্মম তা বুঝতে কোন বিচক্ষণ লোকেরই বাকী নেই।

অশিক্ষিত মূর্খ মানুষও অন্য কিছু বুঝুক আর না-ই বুঝুক বঞ্চনা অবহেলাকে বেশ বুঝতে পারে। আমাদের দেশে এখনও এই বঞ্চিত অবহেলিত লোকের সংখ্যাই বেশি।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখুক।

অবহেলা ও বঞ্চনার মাঝখানেও রাজ্যের শিল্প পরিবেশের আমরা মোড় ঘোরাতে চাইছি রুগ্ন শিল্প পুনরুদ্ধার, ছোট মাঝারি শিল্পের প্রসার এবং বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার জন্য আমরা সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়ে যাব। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিরে এসেছে সুস্থ আবহাওয়া। সংস্কৃতি, খেলাধুলা সব কিছুতেই আমরা নতুন পদক্ষেপ নিতে চাইছি। এরাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার দেশব্যাপী সংকটের বিরুদ্ধে এক বিকল্প নীতির ভিত্তিতে, বিকল্প পথে চলতে চায়। আর এরজন্য আমরা চাই জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা—৮/৮৭-৮৮/আই এণ্ড সি এ নদীয়া।

দশটি বছর ছিল নতুন সম্ভাবনায় উজ্জ্বল

দশ বছর আগে মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। মাঝে আরও দু'বার মানুষ রায় দিয়েছে আমাদেরই পক্ষে। বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বারের মত কাজ শুরু করেছে।

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনাই ছিল আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই রাজ্য সারাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রবর্ঘাঁটি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। সারাদেশের বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যেও আমরা এই ঐতিহ্য বজায় রাখব।

মানুষের সহযোগিতায় আমাদের নিম্নতম কর্মসূচীর রূপায়ণ আমরা করে চলেছি। গ্রামীণ অর্থনীতির বৈষম্য আমরা সাধ্যমদূর করব। বাড়তি জমি ভূমিহীনদের মধ্যে ভাগ করা হচ্ছে। গ্রামের গরীবের অধিকারগুলি সুরক্ষিত হচ্ছে। পঞ্চায়েব্যবস্থা গ্রামীণ জনগণের উদ্যোগের প্রতীক।

অন্নের অন্বেষণে অরণ্য

কোটি কোটি বছর আগের কথা। প্রাণের চিহ্ন বিহীন পৃথিবীর আবহ তখন ছিল কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পূর্ণ। এরপর উদ্ভিদ জগতের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবহ মণ্ডলে জমলো অক্সিজেন, যার ফল হিসেবে দেখা দিল প্রাণী জগৎ। উদ্ভিদই বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে ত্যাগ করে অক্সিজেন-প্রাণী জীবনের পক্ষে যা অপরিহার্য।

এছাড়াও আমাদের খাদ্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অরণ্যই জোগায়। অরণ্য ব্যতীত আমাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু উন্নতির নামে সর্বত্র চলেছে বৃক্ষ নিধন। পরিবেশ ধ্বংসকারী এই কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। অরণ্য চিরজীবী হলে তবেই আমরা রক্ষা পাবো। রক্ষা পাবে পৃথিবীর প্রাণীকুল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ১৪/৮৭-৮৮ আই-এণ্ড-সি-এ/নদীয়া

বৈরাগী

কাকলি ভট্টাচার্য

সুমনদের ঘরের পেছনে পেয়ারা গাছের ডালে দুটো শালিক ক'দিন ধরে সমানে কাঠি-খড় এনে বাসা বাঁধছে আপন মনে। সুমন জানলার ধারে বসে বসে তা দেখে। পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বই-এর পাতা থেকে চোখ দুটো কখন জানলার ফাঁক গলে সেই পেয়ারার ডালটিতে আটকে যায় সে নিজেই টের পায়না। একটা পাখি উড়ে যায় আর একটা পাখি আসে। দুজনের মুখেই ঘাস-খড় কিছু না কিছু ধরা আছে। একটা শালিক লম্বা একটা সেলোফেন পেপার কোত্থেকে যেন টেনে টেনে নিয়ে আসছে। ওটা আনার সময় হাওয়ায় উড়ে ফড়ং ফড়ং আওয়াজ হচ্ছে আর পাখিটা বার বার চমকে গিয়ে ফেলে দিচ্ছে ওটা। ইতস্ততঃ করে আবার ঠোঁটে তুলে আনছে, এমনি করে ওটাকে শেষঅব্দি বাসা পর্য্যন্ত নিয়ে এলো। এমন সময় সুমনের মা ডাক দিলেন —'বই গুছিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়। স্নান খাওয়া করতে করতে স্কুলের বাস এসে যাবে।'

সুমন ষ্ট্যাণ্ডার্ড থি-এর ছাত্র। তার পড়াশুনায় বিশেষ আগ্রহ নেই দেখে তার মা হতাশ হয়ে যান মাঝে মাঝে। কিন্তু সুমনের উপর কোন কিছু কাজের ভার দিলে সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে করে আসে। তাই স্কুলে ক্লাসের মধ্যে তার কদর না থাকলেও স্কুলের নানারকম অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকম দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়ে সুমনের উপর। সেও তাতে দারুণ খুসী হয়।

সেদিন সুমন স্কুলে গিয়ে পড়াশোনায় মন দিতে পারল না তেমন, কেবলই শালিক দুটো আর তাদের বাসাটার কথা মনে হতে লাগল। মনে হল তারাএর পরে কি করছে, কেমন করে বাসাটা শেষ অব্দি বানালো ইত্যাদি।

স্কুল থেকে ফিরে সুমন চুপি চুপি বাসাটা দেখতে লাগল। একটা শালিক পাখী বাসায় চুপটি করে বসে আছে। জানলায় খুট করে শব্দ হতে পাখিটা ঘাড় ঘুরিয়ে সুমনের দিকে পিট্ পিট্ করে তাকাতে লাগল। সুমন ভাবল পাখিটা বুঝি ভয় পেয়েছে, সে জানলা থেকে সরে এলো।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই সুমন আর লোভ সামলাতে পারল না। বাসাটা কাছে থেকে দেখার। সে আস্তে আস্তে পেয়ারা গাছের কাছে গেল। পাখি দুটো ধারে কাছে নেই, এই সুযোগে সে পেয়ারা গাছটায় উঠে পড়লো টপ্ করে। বাসাটার কাছে গিয়ে উঁকি দিতেই সে চম্‌কে গেল। বাসার মধ্যে একটা ছোট্ট চকচকে ডিম পড়ে আছে। খুব লোভ হল তার ডিমটা একবার হাতে নিয়ে দেখে, কিন্তু মায়ের কাছে সুমন শুনেছে ডিমে একবার হাত দিলে সে ডিম ফুটে আর বাচ্চা বেরোবে না। তাই সে হাতটা বাড়িয়েও হাতটা গুটিয়ে নিল। এমন সময় একটা শালিক উড়ে এসে কট্ মট্ করে ওদের ভাষায় কি যেন সব বলে চক্কোর দিয়ে বাসার চারপাশ উড়তে লাগল। সুমন তাই দেখে তড়ি ঘড়ি করে গাছ থেকে নামতে গিয়ে পা ফস্‌কে পড়ে গেল নীচে। কয়েকদিন সে আর বাসার কাছে গেলনা। জানলা দিয়ে দেখে প্রায় সময়ই একটা পাখি বাসায় চুপটি করে বসে আছে।

একদিন ভোর না হতেই সুমন অনেকগুলো পাখির কিচ্ কিচ্ শব্দ শুনলো। জানলা দিয়ে নরম সূর্য্যের আলো আসছে ঘরের মধ্যে। সুমন বিছানা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। আঙ্গুল দিয়ে চোখ দুটো রগড়িয়ে পাখির বাসাটার পানে তাকিয়ে সে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। দেখে যে তিনটে পাখির বাচ্চা বড় বড় তিনটে হাঁ করে আছে আর মা পাখিটা ঠোঁটে নিয়ে কি সব খাইয়ে দিচ্ছে এক একজনকে। খাওয়া শেষ হলে তিনটে বাচ্চা ঠোঁট উঁচু করে আবার খাওয়ার জন্য কিচ্ কিচ্ শব্দ করছে। মা পাখিটা একবার করে উড়ে যায় আবার ফিরে

আসে খানিক পরে ঠোঁটের মধ্যে খাবার নিয়ে। সুমনের বিস্ময়ের ঘোর কাটলো মায়ের ডাকাডাকিতে। সে উঠে মুখ ধুতে গেল।

প্রতিদিন পাখির বাচ্চাগুলো দেখে দেখে সুমনের খুব ইচ্ছা হয় একটা বাচ্চা এনে সে পুষে তাকে কথা বলতে শেখায়। বাচ্চাটা বড় হয়ে তার সারাক্ষণের সঙ্গী হবে। সুমন দেখে রেখেছে সামনের মাঠটায় অনেক ঘাস ফড়িং আছে। ওগুলো পাখিদের খুব প্রিয় খাদ্য। ওগুলো ধরে এনে পেট ভরে খাওয়াবে। সুমন ভাবলো আর একটু বড় হোক, যখন একটু উড়তে শিখবে একদিন সন্ধ্যারেলায় চুপি চুপি গিয়ে একটাকে তুলে নিয়ে আসবে, তাহলে আর পালাতে পারবে না।

সেদিন অনেক রাতে খুব ঝড় উঠলো। তার সঙ্গে বৃষ্টিও হ'ল খুব। ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দে সুমনের খুব ভয় করতে লাগলো শেষ রাতে ঝড় থেমে গেল, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল তখনও। ভোরের বেলা সুমন জেগে ভাবতে লাগলো পাখির বাচ্চাগুলো কেমন আছে কি জানি! বাইরে বেরিয়ে দেখে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! পাখির বাসাটা গাছের উপর নেই, নীচে খানিকটা দূরে উল্টে পড়ে আছে। সুমনের বুকের মধ্যে একটা দুঃখ দলা পাকিয়ে হায় হায় করে উঠলো। সে ছুটে গেল বাসাটার কাছে, বাসাটা তুলতেই চমকে গেল সুমন। দেখে কি একটা পাখির বাচ্চা বাসাটার মধ্যে আটকে পড়ে রয়েছে, চোখ বন্ধ বুকটা শুধু ধুকপুক করছে। ওটাকে সাবধানে দুহাতে মুঠির মধ্যে নিয়ে এদিক ওদিক তাকালো একবার। নাঃ আর বাচ্চাগুলোর কোন হদিশই নেই সে ছুটে মায়ের কাছে রান্নাঘরে গেল—'মাগো, ওমা দেখেছ।' সুমন আর কিছু বলতে পারলো না। মায়ের কাছে গিয়ে দু-হাতে মুঠি খুলে দেখালো। মা পাখির বাচ্চাটাকে দেখে বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—'কোথায় পেলি এটা।' সুমন সেকথার উত্তর না দিয়ে বললো—মা, এটা এখনও বেঁচে আছে, একে তুমি ভাল করে দাও মা।' মা বললেন—'আন্ দেখি, এই উনুনের পাড়ে এনে বসিয়ে দে,

ভিজে গেছে একেবারে যে।' সুমন মায়ের কথামত বাচ্চাটাকে উনুনের ধারে বসিয়ে দিয়ে ধরে রাখলো হাতে। মা তাড়াতাড়ি বাটিতে অল্প একটু দুধ গরম করে ফোঁটা ফোঁটা তাঁর মুখে দিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। পাখিটা ঠোঁট ঝেড়ে ঝেড়ে বার বার তার প্রতিবাদ করতে লাগলো। মায়ের ব্যবস্থাপনায় এরপরে সুমন পাখির বাচ্চাটাকে নিয়ে একটা তুলোর খোপের মত বানিয়ে তারমধ্যে বসিয়ে দিল আর মনে মনে বার বার বলতে লাগল—'হে মা কালী পাখির বাচ্চাটাকে তুমি বাঁচিয়ে দাও তোমায় আমি অনেক সন্দেশ খাওয়াবো।' মা কালী হয়ত বা তার পাখি পোষার সাধের কথা জেনেই ফেলেছিলেন, কিংবা সন্দেশ খাওয়ার লোভেও হতে পারে—পাখির বাচ্চাটা আস্তে আস্তে বেঁচে উঠলো।

সুমন বাচ্চাটার নাম দিল বৈরাগী। বৈরাগীর ছোট্ট দুটি ডানা বড় হ'ল, বৈরাগী উড়তে শিখলো। সারাক্ষণ সে সুমনের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় কখনও বা উড়ে গিয়ে সুমনের কাঁধের উপর চুপটি করে বসে থাকে। সুমন তাকে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে মাঠ থেকে ঘাস ফড়িং ধরে এনে খাওয়ায়।

সুমনের মায়ের ডাক শুনে শুনে বৈরাগী একদিন সুন্দর করে টেনে টেনে ডেকে উঠল সু—মন, সু—মন সুমনের সেদিন কি ফুর্তি। সে বৈরাগীকে মাথার উপর বসিয়ে নাচানাচি শুরু করে দিল। বৈরাগী আরও কয়েকটা ছোট ছোট কথা শিখে ফেললো চটপট্। বৈরাগীকে খাঁচায় রাখা হয়েছে, পাছে বেড়াল বা কুকুর ধরে ফেলে এই ভয়ে। ক'দিন ধরে সুমন লক্ষ্য করছে তারা কেউ ধারে কাছে না থাকলে খাঁচাটার চারপাশে আর একটা শালিক পাখি এসে ঘুর ঘুর করে আর বৈরাগীর সঙ্গে কিচি-মিচি করে কত কি কথা বলতে থাকে। কাউকে দেখলেই চট্ করে উড়ে পালায়।

সেদিন সুমন স্কুলে গেছে। তার মা খাচা খুলে বৈরাগীকে খাবার দিয়ে খাঁচাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছিলেন। খানিক পরে মনে হওয়াতে তাড়াতাড়ি এসে দেখেন বৈরাগী খাঁচা থেকে

বেরিয়ে চালের উপর গিয়ে চুপচাপ বসে আছে। সুমনের মা কতবার ডাকলেন, বৈরাগী একসময় ফুড়ুৎ করে কোথায় উড়ে গেল তাকে আর দেখা গেলনা।

স্কুল থেকে ফিরে সুমন মায়ের কাছে সমস্ত শুনে কেঁদেই ফেললো। রাত্রে মন খারাপ বরে কিছু খেলনা। মা কত ডাকলেন তবুও সে উঠলো না। রাত্রে সুমন স্বপ্ন দেখলো বৈরাগী চালের উপর বসে আস্তে আস্তে ডাকছে সু-মন সু-মন।

কিছুদিন কেটে গেছে। সুমন বৈরাগীর কথা তেমন করে আর মনে রাখেনি। সেই খাঁচাটা সে তার এক বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছে পাখি পোষার জন্য। তার বন্ধু একটা টিয়াপাখির বাচ্চা এনে রেখেছে।

একদিন সুমন ভোরের বেলা আধো ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলো তার নাম ধরে কে যেন দূর থেকে ডাকছে। সুমন জেগে উঠে বসলো বিছানায়। মাথার কাছে জানলার দিকে যেই তাকালো দেখে পেয়ারা গাছের ডালে বসে বৈরাগী আস্তে আস্তে ডাকছে সু-মন, সু-মন। সুমন ভাবলো সে স্বপ্ন দেখছেনা তো!

কবি নবীনচন্দ্র

প্রশান্ত শর্মা

একজন প্রাবন্ধিক কবি নবীনচন্দ্র সেন সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন—"নবীনচন্দ্রই সম্ভবত আমাদের দেশে প্রথম কবি, যিনি কাব্যের মধ্য দিয়া মানব জাতির ঐক্য ও পৃথিবীর অখণ্ডত্বের কথা প্রচার করিয়াছেন।"

সমসাময়িক যুগে নবীনচন্দ্রের কাব্য মহাকাব্যের সমাদর পেয়েছে। তাঁর কাব্যের সংখ্যা বেশি নয়। "পলাশির যুদ্ধ" ছাড়া বৃহৎ কাব্যের মধ্যে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস।

'পলাশির যুদ্ধ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। এই কাব্যের বিষয় বস্তু পলাশির প্রান্তরে নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ ও বাঙালীর ভাগ্য বিপর্যয়।

নবীন চন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্য রৈবতক। "রৈবতক" প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। "কুরুক্ষেত্র" ১৮৯৩ ও "প্রভাস" প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে।

কবি তাঁর লেখা রৈবতক কাব্য খানি উৎসর্গ করেন তাঁর পিতাকে কুরুক্ষেত্র মাতাকে এবং প্রভাস উৎসর্গ করেন নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে। রৈবতক কাব্যে তিনি বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা আর প্রভাসে অন্তিমলীলা। বলা চলে রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।

কর্মজীবনে নবীনচন্দ্র ছিলেন সরকারী ডেপুটী। ডেপুটীগিরির দায়িত্ব ভার পালন করেও কাব্য সরস্বতীর সাধনা করে গেছেন নিরলস ভাবে। আধুনিক কালের কবিকুল ক'জন যে আজ তাঁদের অতীত লিপ্সু মনটাকে দেড়শ' বছর পেছন ফেলে নবীন চন্দ্রকে খোঁজেন বলা ভার।

নবীন প্রসঙ্গ

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

এক দিনের কথা বলিতেছি। মাঝে মাঝে আমি প্রায়ই নবীন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রাণাঘাটে আসিতাম। নবীনবাবু আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সে স্নেহ অকৃত্রিম আন্তরিকতা পরিপূর্ণ। তাহাতে মহৎ ও ক্ষুদ্রের মধ্যে ব্যবধান-পার্থক্য ছিল না। সে স্নেহকে সৌহার্দের নামান্তর বলিলে অন্যায় হইবে না। তাঁহার সহিত সকল কথাই হইত।

সে দিনও কোনও এক পর্বদিন। আদালত বন্ধ। সকালের ট্রেনে রাণাঘাটে উপস্থিত হইয়া নবীন বাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম, তিনি বাহিরের বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিতেছেন। পার্শ্বে তাঁহার পত্নী। আমাকে আসিতে দেখিয়া তিনি গৃহান্তরে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, নবীন বাবু বলিলেন, "কাহাকে দেখিয়া পলাইতেছ? গিরিজাকে দেখিয়া লজ্জা!—গিরিজাও একটি ছোট খাটো কবি। গিরিজার কবিতা দেখ নাই? বেশ মিষ্ট লেখে।" নবীন বাবুর স্ত্রী সসঙ্কোচে দাঁড়াইলেন।

তাহার পর নবীন বাবু বলিলেন, "ঘরের ভিতর চল। আজ তোমাকে আমার নূতন কাব্যের কয়েক পৃষ্ঠা শুনাইব।" আমি তাঁহার অনুগমন করিলাম। নবীন বাবু একখানি টেব্‌লের সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"আমার 'রৈবতক' পড়িয়াছ কি?" আমি উত্তর করিলাম, 'রৈবতক' বাহির হইলেই আমি এক কপি পিপল্‌স লাইব্রেরী হইতে কিনিয়াছিলাম। সে আজ ৪।৫ বৎসরের কথা।" নবীন বাবু বলিলেন, 'রৈবতক' তোমার কেমন লাগিয়াছিল?" আমি উত্তর করিলাম, "পড়িয়া ভাল বুঝিতে পারি নাই। আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকিয়াছিল। আপনার 'পলাশীর' মত রৈবতক'

হয় নাই।" নবীন বাবু হো-হো করিয়া হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি 'রৈবতকের' উদ্দেশ্য বুঝ নাই। আমি 'রৈবতকে' প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র যাহা, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তোমরা বা সাধারণে কৃষ্ণকে ক্রূর, কুচক্রী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া জান। মহাভারত পড়িয়াছত? কৃষ্ণ লইয়াই মহাভারত। কৃষ্ণই খণ্ড ভারতকে মহাভারতে পরিণত এবং একচ্ছত্র সম্রাটের অধীন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি 'রৈবতকে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা বর্ণনা করিয়াছি।" আমি বলিলাম "আপনার 'রৈবতকের' কৃষ্ণ দ্বিতীয় বিস্‌মার্ক। সেইরূপ রাজনীতি বিশারদ ও সুচতুর।" নবীন বাবু বলিলেন, "কৃষ্ণ চরিত্রের এক দিক দেখিয়া তুমি ওরূপ বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণ বাস্তবিকই আদর্শ পুরুষ। তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিতে পারি, সেরূপ যোগ্যতা আমার নাই। তবে কৃষ্ণচরিত্র আমি যেরূপ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা আমার পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। ইহাই আমার শ্লাঘা।" বাস্তবিক এ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু এবং নবীন বাবুর মধ্যে কে অগ্রণী, তাহার বিচার একবার হইয়াছিল। কিন্তু সুমীমাংসা হয় নাই। কারণ তখন বঙ্কিম বাবু জীবিত ছিলেন না।

'রৈবতক'-প্রসঙ্গ এই স্থানেই শেষ হইল। তাহার পর নবীন বাবু তাঁহার নূতন মহাকাব্য (যাহা তখন পাণ্ডুলিপির আকারে ছিল) 'কুরুক্ষেত্রের' কথা পাড়িলেন। পাণ্ডুলিপির খাতাটি দেখিলাম, অতি বৃহৎ। নবীন বাবু বলিলেন, "এই 'কুরুক্ষেত্রে' আমি কৃষ্ণচরিত্র পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কৃষ্ণের মহত্ব কোথায়, কিসে তিনি বড়—কিসে তিনি আদর্শ মানব তাহার পরিচয় 'কুরুক্ষেত্রে' পাইবে। ছাপা হইলেই তোমাকে তৎক্ষণাৎ 'কুরুক্ষেত্র' পাঠাইয়া দিব।" আরম্ভ কেমন হইয়াছে পড়িতেছি, শুন। বলিয়া পড়িলেন;

"নীরেন্দ্র প্রতিম নীল নির্ম্মল আকাশ,
শরতের শেষ মেঘে উর্দ্ধে তরঙ্গিত—

নীরব, নিস্পন্দ, ভীত। নিম্নে তরঙ্গিত
চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
গর্জ্জিতেছে রক্তসিন্ধু মহাভারতের
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! সান্ধ্য রবিকরে
দেখাইছে রক্তমেঘে প্রতিবিম্ব তার,
নীরব নিস্পন্দ ভীত বিশ্ব চরাচরে।
দুই প্রান্তে সংখ্যাতীত সজ্জিত শিবির,
তরঙ্গিত বেলা যেন রণ-পয়োধির।"

পাঠান্তে আমার মুখের দিকে, চাহিয়া তিনি বলিলেন "কেমন, 'মেঘনাদের' চেয়ে 'কুরুক্ষেত্রের' আরম্ভ grand হয় নাই কি?" বাস্তবিকই 'কুরুক্ষেত্রের' আরম্ভ শ্লোকগুলি বেশ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইল। আমি দুই দিক রক্ষা করিয়া উত্তর করিলাম, "হাঁ, এরূপ বর্ণনা আর কোনও কাব্যে দেখি নাই।" এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখি। নবীন বাবুর পাঠভঙ্গী আমার কানে একটু বিসদৃশ লাগিত। বোধ হয়, তাহার কারণ, উচ্চারণে তিনি জন্মভূমির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি হেমবাবুর পাঠভঙ্গীর নিন্দা করিতেন! যাউক সে কথা।

নবীন বাবু আরম্ভ অংশ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন 'কুরুক্ষেত্রের' পঞ্চদশ সর্গে —যে স্থানে আমি বীরের শোক বর্ণনা করিয়াছি, পড়িতেছি, শুন।" তিনি উক্ত সর্গের অধিকাংশ পড়িয়া শুনাইলেন; আমার মতামতের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবীর কোন কাব্যে কোন কবি বীরের শোক এমন করিয়া চিত্রিত করেন নাই। বল দেখি, অর্জ্জুনের শোকচিত্র বীরের অনুরূপই অঙ্কিত হইয়াছে কি না।" আমি শেষ কথায় সায় দিয়া বলিলাম, "হাঁ বীরের শোক রমণীসুলভ হা-হুতাশ-ক্রন্দন হইলে চিত্রটি নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কুরুক্ষেত্র' কত দিনে ছাপা হইবে?" নবীন বাবু বলিলেন, "আমার একটি ভাগিনেয় জেদ

করিয়া এতদিন ছাপা বন্ধ রাখিয়াছিল। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য নানা কারুকার্য্যে খচিত করিয়া মুদ্রিত করিবে। কিন্তু তাহার অকালমৃত্যুতে সকল আশায় ছাই পড়িয়াছে। অতঃপর 'কুরুক্ষেত্র' যেমন তেমন করিয়াই ছাপাইব বলিতে বলিতে নবীন বাবুর দুইটি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। নবীন বাবু ভাগিনেয়টিকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার ভাগিনেয়ের স্মৃতি চিরদিন 'কুরুক্ষেত্রের' সহিত জড়িত থাকিবে।

এমন সময়ে আমাদের আহারের আহ্বান আসিল। আহারান্তে মধ্যাহ্ন বিশ্রামে কাটিল। অপরাহ্নে আবার সাহিত্য-কথা। এবার 'পলাশির যুদ্ধের' কথা উঠিল। পলাশি'-প্রসঙ্গে নবীন বাবু বলিলেন—'পলাশি' পুস্তকাকারে প্রথম আরম্ভ করি নাই। একটি সুদীর্ঘ কবিতা হিসাবে প্রথম লিখিয়াছিলাম। তখন আমি যশোহরের ডেপুটী। বয়স বোধ হয়, উনিশ কি কুড়ি তাহার বেশি নহে। 'পলাশির এখন যাহা দ্বিতীয় সর্গ অর্থাৎ কাটোয়া—বৃটিশ শিবির—তাহাই 'পলাশির আরম্ভ ছিল। পরে কয়েক জন সাহিত্যিক বন্ধুর অনুরোধে উহা কাব্যাকারে পরিণত করি।" নবীন বাবু বলিলেন ইহার প্রথম সর্গের প্রায় অধিকাংশ যশোহরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট (তাঁহার নাম নবীন বাবুর মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম মনে নাই) ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া অনুবাদের খাতাটি আমাকে দেখিতে দিলেন। ইংরাজের অনুবাদ—বোধ হয় নবীন বাবু শ্লোকের মর্ম্মার্থ ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—যথাযথ এবং সুন্দর হইয়াছে দেখিলাম। ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়া বোধ হইল যেন বায়রণের **Childe Harold** পড়িতেছি। লেখকের হস্তাক্ষরও যেন মুক্তা বর্ষিয়া গিয়াছে।

'পলাশির যুদ্ধ প্রসঙ্গে নবীন বাবু বলিলেন "এই 'পলাশি লিখিয়া আমার ক্ষতি-লাভ দুই-ই হইয়াছে।" আমি বলিলাম "সে কি রকম?" নবীন বাবু বলিলেন, 'পলাশির যুদ্ধে যেমন আমার কবিযশের প্রতিষ্ঠা, তেমনই রাজকার্য্যে **Promotion** বন্ধ। ইহার বহুদিন পূর্বেই আমি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইতে

পারিতাম। কিন্তু 'পলাশির যুদ্ধ' লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইয়াছি।" ইহার কিছুদিন পরেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিবার জন্য নবীন বাবুর নিকট বিদায় লইলাম। বিদায় দিবার সময় নবীন বাবু বলিলেন,—

"বোধ হয় এই সপ্তাহে হীরেন, রবি ও সুরেশ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। তুমি আসিয়া যোগ দিলে বড়ই আহ্লাদিত হইব।" আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সৌজন্য : আর্যাবর্ত্ত ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩১৯

সংগ্রাহক : কেশবলাল চক্রবর্তী

সম্পাদকের সংযোজন : নবীন প্রসঙ্গের লেখক গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় নিজেও একজন কবি ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ নবীনচন্দ্র যখন রানাঘাটের মহকুমা শাসক, প্রশাসক এই কবির ঘরে তখন অনেক কবি-সাহিত্যিকের আগমন ঘটতো। রবীন্দ্রনাথও একবার এসেছিলেন। সে তারিখটি ছিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর। এখনও ঐ তারিখে রানাঘাটের মহকুমা শাসকের বাংলো বাড়িতে নবীন-রবি মিলনোৎসব পালিত হয়। অনেক লেখক কবির আগমন ঘটে সেই উপলক্ষে।

গিরিজানাথও একবার এসেছিলেন। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে গিরিজানাথের সাক্ষাতের বর্ণনাই তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর এই লেখাটিতে। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় "আর্যাবর্ত্ত" নামক একটি সাময়িকীতে। এখানে তা পুনর্মুদ্রিত হল।

প্রাচীন গুপ্তিপাড়া, মন্দিরে টেরাকোটার অমূল্য সম্পদ

মাধব ভট্টাচার্য

জনশ্রুতিটা অনেকটা এরকমই। চৈতন্যদেব নাকি একবার নদীপথে নৌকো করে গুপ্তিপাড়ায় এসেছিলেন। গুপ্তিপাড়ার গঙ্গার ঘাটে এক সকালে চৈতন্যদেবের নৌকো এসে ভিড়েছিল।

ঘাটের অনতিদূরে আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে স্নান শেষে সূর্য প্রণাম করছিলেন মাঝ বয়সী এক যুবক। তার মুখে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন চৈতন্যদেব। পরিচয় জানতে চাইলেন।

যুবকটি ভয়ে ভয়ে বলল—আমার আর পরিচয় কি! আমি শূদ্র বংশজাত—রুইদাস।

শুনে আরো অবাক হয়ে গেলেন চৈতন্যদেব। মনে মনে ভাবলেন অব্রাহ্মণ এই রুইদাস এত সুন্দর সংস্কৃত উচ্চারণ শিখলো কি করে।

চৈতন্যদেব রুইদাসকে জিজ্ঞেস করলেন এত সুন্দর সংস্কৃত তুমি কোথা থেকে শিখলে?

রুইদাস বলল এখানেই। কত টোল রয়েছে এখানে! টোলে পড়েই শিখেছি।

চৈতন্যদেব জানতে চাইলেন ক'টা টোল আছে এখানে? রুইদাস বলল আশিটা।

রুইদাসের মুখে ৮০টা টোলের কথা শুনে চৈতন্যদেব আর অপেক্ষা করলেন না। নৌকোয় বসেছিলেন সেই অবস্থাতেই মাঝিকে বললেন—নৌকো ভাসিয়ে দাও।

মাঝি তো অবাক। চৈতন্যদেব বললেন—হ্যাঁ ভাসাও। যেখানে ৮০টা টোল সেখানে আমার আর প্রয়োজন কি!

মাঝি নৌকো ভাসিয়ে দিল। গঙ্গার ঢেউ কেটে কেটে

নৌকো এসে ভিড়লো গুপ্তিপাড়ার উল্টোদিকে শান্তিপুরের ঘাটে :

এতসব বলার অর্থ পাঁচশ বছর আগে এরকমই ছিল গুপ্তিপাড়ার সংস্কৃতচর্চা, এমনি ছিল গুপ্তিপাড়ার বিদ্বৎ সমাজ। শুধু তাই নয় শিল্প সংস্কৃতির ভাণ্ডারও ছিল ভরা।

আজ আর সেদিন নেই। টোল ওঠে গেছে। সেই সমাজ সেই শিল্প ভাবনা নেই। গুপ্তিপাড়াকে আজ যারা চেনেন-চেনেন এখানকার বৃন্দাবন মন্দিরের জন্য। খুব যে বিশালকার মন্দির তা নয় তবে প্রাচীন স্থাপত্য আর মন্দিরের গা জুড়ে টেরাকোটার এক অমূল্য সম্পদ।

কত পুরনো হবে এই মন্দির! যতদূর জানা যায় ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশার আমলে তৈরী। মন্দির আছে সবশুদ্ধ ৪টি। বাকী ৩টি মন্দির বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে।

প্রথম মন্দিরের পরিচয় বৃন্দাবন জীউ মন্দির।—প্রতিষ্ঠাতা সত্যদেব সরস্বতী। সত্যদেব গুজরাটী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দ্বারকা থেকে এসে শান্তিপুরে এক ব্রাহ্মণ বিধবা কন্যার আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং ফিরে আসার সময় সেই বিধবার গৃহদেবতা বৃন্দাবনকে সঙ্গে নিয়ে আসেন গুপ্তিপাড়ার গঙ্গার পারে প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেও মন্দির নির্মাণের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করেন তাঁরই শিষ্য বিশ্বেশ্বর রায়।

দ্বিতীয় মন্দিরটি রামচন্দ্র মন্দির। শেওড়াফুলির মহারাজা হরিশ্চন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এটি নির্মিত হয়। এই মন্দিরের গা জুড়ে টেরাকোটার কাজ। পোড়ামাটির ছাঁচে রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র আঁকা। রাম রাবণের যুদ্ধ, রামের অকাল বোধন, চৈতন্য মহাপ্রভু এই সব চিত্র খোদিত আছে। এই মন্দিরকে ভারতের টেরাকোটা ভাস্কর্যের এক অমূল্য সম্পদ বলা চলে। অবিশ্যি আজ তা নষ্ট হতে বসেছে। এই মন্দিরের বিগ্রহ-রাম সীতা লক্ষ্মণ ও হনুমান।

বাকী দুটো মন্দির সম-সাময়িক কালের। নবাব আলীবর্দী যখন মুর্শিদাবাদের মসনদে তখন তাঁর অর্থানুকূল্যে একটি, আর একটি শ্যামবাজারের মহারাজা গঙ্গারামের কীর্তি। পাথর

বা কষ্টিপাথর নয় সবকটি মন্দিরের বিগ্রহই দারুকাঠের তৈরী।

পর্তুগীজদের সঙ্গে যখন ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে তখন লর্ড ক্লাইভ এই মঠে এসে আত্মগোপন করেছিলেন। তিনরাত্রি কাটানর পর তাঁকে গোপনে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল।

পরবর্তী কালে ক্লাইভ যখন বাংলার গভর্ণর হলেন তখন আবার একদিন এই মঠে এসেছিলেন তিনি। মঠের মোহন্তকে কিছু উপহার দিতেও চেয়েছিলেন সে সময়।

মোহন্ত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ক্লাইভের কথা শুনে বললেন আমার তো কিছু চাইনা। আমি সন্ন্যাসী। বিষয় সম্পত্তি দিয়ে আমি কি করবো?

ক্লাইভ মঠের নামে কিছু সম্পত্তি এবং গুপ্তিপাড়ার খেয়া পারাপারের ঘাটটি দান বন্দোবস্ত করে দিলেন।

বহু রাজা-মহারাজার দানে এক সময় এই মঠের সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার একর দাঁড়িয়েছিল বলে বর্তমান মোহন্ত কথায় কথায় জানালেন। এখন অধিকাংশ সম্পত্তিই হাতছাড়া। ক্লাইভের দেওয়া খেয়া ঘাটটি আর সামান্য কিছু জমি আছে এখন। খেয়া ঘাট লিজ দিয়ে বছরে ছয়শ' টাকা পায় মঠ।

মঠের এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। সংস্কারের অভাবে মন্দিরগুলো নষ্ট হতে বসেছে। দোল আর রথের সময় এখানে মেলা বসে। এক সময় "এখানকার রথ মাহেশের মতই বিখ্যাত ছিল। পুরনো বই থেকে জানা যায় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে রথ দেখতে এক লক্ষেরও বেশি লোক সমাগম হয়েছিল। আর, সেবারেই নৌকোডুবি হয়ে ৪২ জন মারাও গিয়েছিল।

হাওড়া-বারহাবরা লুপ লাইনে গুপ্তিপাড়া রেল স্টেশন। স্টেশনে নেমে রিক্সা করে মন্দিরে পৌঁছুনো যায়। শান্তিপুর থেকে খেয়ায় গঙ্গা পেরিয়েও যাওয়া যায়।

বৃন্দাবন মন্দিরে পৌঁছুনোর আগেই পড়বে দেশকালীতলা মন্দির, সেন পরিবারের জোড়া শিবমন্দির। এগুলো রেখে সামনে এগোলেই মদনলালের স্মৃতি ফলক। দেশকালীতলা পেরুলেই শ্রীকৃষ্ণের রথ আর বৃন্দাবন মন্দিরের চূড়া দেখা যায়।

বছর বছর নববর্ষ আসে। নববর্ষের প্রথম দিনটাকে আমরা আরো অনেকেরই মত স্বাগত জানাই। বছরের প্রথম দিনে নতুন খাতা মহরত করি। বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীরা আসেন। আসেন আমাদের গ্রাহকরা। আসলে এটাই বড় পাওয়া। সকলকে এক সঙ্গে পাওয়া। সকলের সান্নিধ্য লাভ করা। প্রয়োজনে ত আমরা একে অন্যের কাছে যেয়েই থাকি। আমরা চাই প্রয়োজন ছাড়াও আমাদের কাছে শুভানুধ্যায়ীরা আসুন।

দৃঢ় হোক বন্ধন। সোনার শেকলে বাঁধতে চাই আমরা সকলকে।

এ, টি, জুয়েলার্স

কুলিয়া রেলবাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া

[মাছ বাজারের সন্নিকটে]

প্রোঃ শৈলেন কুমার কর্মকার

'সাহিত্য সৈকত'-এর পরবর্তী সংখ্যাই হল

শারদীয় সংখ্যা

বিভিন্ন জনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ ছাড়াও এবারের শারদ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ হলো বেশ ক'টি জেলার লোক ভাষায় রচিত গল্প। সেই সঙ্গে থাকছে ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের ওপর একটা বিশেষ নিবন্ধ।

এ সংখ্যা থেকেই শুরু হচ্ছে ধারাবাহিক রচনা—

জেলা নদীয়া

সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে যারা আগ্রহী তারা সরাসরি পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করুন।

কলিকাতায় আমাদের পরিবেশক

শ্যামল ভট্টাচার্য

লিটল ম্যাগাজিন স্টল

৭৬, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

জাতীয় মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা, ১৯৮৭

১৯৮৭ সালের জন্য রাজ্য পর্য্যায়ে জাতীয় মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮৭ (রবিবার) তারিখে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, সেণ্ট্রাল বোর্ড অফ্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন এবং আই. সি. এস. সি. কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত বিদ্যালয়ে বর্তমান বছরে দশম শ্রেণীতে পাঠরত এবং নবম থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ গত বাৎসরিক পরীক্ষায় শতকরা কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর প্রাপকরাই এই পরীক্ষায় বসতে পারবে। এই পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্যাদি এবং আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট জেলার মাধ্যমিক শিক্ষার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে ১লা আগষ্ট, ১৯৮৭ তারিখ থেকে পাওয়া যাবে। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র (আবেদনপত্র যে জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে) ২৮শে আগষ্ট ১৯৮৭ তারিখের মধ্যে সেই জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) এর অফিসে জমা দিতে হবে।

রাজ্য সরকারের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের ১২৫তম জন্মবর্ষ উদযাপন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবছর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করেছেন।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে ২ ও ৩ আগষ্ট ১৯৮৭ 'বিজ্ঞান ও সমাজ' বিষয়ে দুটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। আচার্যের জন্মদিন

২ আগষ্ট কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর একটি সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীরও উদ্বোধন হল। এই উপলক্ষে আচার্য রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা ও ইংরেজী মুখপত্র পশ্চিমবঙ্গ ও ওয়েষ্টবেঙ্গল -এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আচার্য রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

তাঁতীদের জন্য গৃহ তথা কর্মছাউনি

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীঅচিন্ত্য রায় নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় ১৪ই জুলাই, ১৯৮৭ তারিখে ৭২টি গৃহ তথা কর্মছাউনি সম সংখ্যক তাঁতীর হাতে তুলে দিয়েছেন। এই গৃহ তথা কর্মছাউনিগুলি কেন্দ্রীয় উদ্যোগাধীন পরিকল্প তাঁতীদের জন্য 'গৃহ তথা কর্মছাউনি' অনুযায়ী মোট ৬·৪৮ লাখ টাকায় নির্মিত হয়েছে। মোট ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমান ভাবে বহন করেছেন। বাকী এক তৃতীয়াংশ, তন্তুবায় সমিতিগুলি সুদহীন দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসেবে দিয়েছে। এই সুবিধাপ্রাপ্ত তাঁতীরা ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড, টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং নতুন ফুলিয়া তন্তুবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্য।

এবার পুজো অনেক এগিয়ে। আর তো মাত্র একমাস। তারপরই পুজোর আনন্দময় দিনগুলো এসে যাবে। আমাদের পুজোর বাজার অবিশ্যি শুরু হয়ে গেছে আগষ্টের প্রথম থেকেই। এবার এসেছে ডিজাইনের নতুনত্ব। সবই আমাদের শিল্পীর। আমাদের শিল্পীরাই এখানে বসে সুতোয় ডিজাইন তুলেছেন। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের ছবি এঁকেছেন সুতোর নকশায়।

আমাদের তৈরী টাঙ্গাইল শাড়ীর সুনাম আপনারাই প্রচার করেছেন। আপনাদের দেওয়া সেই পুরস্কারের ঐতিহ্য আমরা বজায় রাখতে বদ্ধ পরিকর।

প্রাক পুজোয় আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ।

ধীরেন বীরেন বসাক এণ্ড কোং

ফুলিয়া চটকাতলা, বয়রা, নদীয়া

দূরভাষ—ফুলিয়া ৩২

SAHITYA SAIKAT
July-September'87 Rs. 2-00

Regd. No. 42112/81 R. N. I
Postal Regd. No. WB/NDA/(S) 73

পূজোর সম্ভারে পূর্ণ আজি এ ঘর
বন্ধু স্বজন সবারে করি আমন্ত্রণ

★

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়নশিল্প সমবায়
সমিতি লিমিটেড

টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায়
সমিতি লিমিটেড

বৈঁচা বসাকপাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া

দূরভাষ—ফুলিয়া ২২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য □ প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।